ব্যাবিলন কথকতা

প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৬

ব্যাবিলন গ্রুপ

সম্পাদকীয়

এমদাদুল ইসলাম

পোষাক শিল্পাঙ্গনে সাহিত্য পাতার প্রকাশনা ভাবা যায়? বিশ্বাস হয়না তাই না ? হ্যাঁ, প্রায় অসম্ভবই সম্ভব হয়েছে আমাদের সবার প্রাণের ব্যাবিলনে।

স্বপ্নটা লালন করে আসছিলাম আমরা অনেক দিন ধরেই। তবে সাধ আর সাধ্যের ভেতরকার পারস্পরিক টানা পোড়েনটা ছিল সব সময়ই খুব প্রবল। তাছাড়া পোষাক শিল্পে কাজ করে সময় মত লাঞ্চ-ডিনার খাবার সময়ই যেখানে মেলেনা সেখানে সাহিত্য পত্রিকা বের করার মত বিলাসী উদ্যোগের ফুরসত কোথেকে পাওয়া যাবে? তারপরেও ঐ যে বলে যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। কথাটা যে খুব সত্যি সে আপনারাও বলবেন। একবার আমাদের যে কোন একটা প্রডাকশন ফ্লোর ঘুরে আসুননা। কি দেখলেন? পাটহীন বেশভূশায় পেলেন একজনকেও? না, কর্মী থেকে কর্মকর্তা সবাই আসেন পরিপাটি হয়ে।

তা যুক্তি তক্কো যতোই থাকুক স্বীকার করতে হবে এমন ধারা উদ্দ্যোগ বাস্তবায়ন সালাম স্যারের উৎপাদন চাহিদা মেটানোর চাইতেও কঠিন কাজ। এর জন্যে শুধু ইচ্ছেটাই যথেষ্ট নয়। চাই একটা চমৎকার টীম ওয়ার্কও।

আমাদের সৌভাগ্য এমন একটা টীম আমরা পেয়েছিলাম। ব্যাবিলনের পরিচালক পর্ষদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎসাহ ও প্রশ্রয়ের ছায়াতলে এই রকম একটা দুরুহ কাজের জন্য আমরা পেয়েছিলাম সাইফুল হক, ফারহানা, স্বাধীন, আরিফ ও সোনিয়া ইসলাম (রিতু) এর মত এক কর্মী বাহিনীকে। সোনিয়ার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। অনেক দিন ধরে ব্যাবিলন থেকে অফিসিয়ালি বিচ্ছিন্ন থেকেও সে যে ভাবে 'ব্যাবিলন কথকতা' এর জন্য সময় দিয়েছে তার জুড়ি মেলানো ভার। আমি মনে করি ওর কমিটমেন্ট ছাড়া এই ম্যাগাজিন প্রকাশ অসম্ভব হতো।

এই সংকলনের লেখার মান নিয়ে তেমন কিছু বলার নেই। লেখা যাদের নেশা, পেশা কোনটাই নয় তাদের প্রচেষ্টা দিয়েই সেজেছে ব্যাবিলন কথকতা এর প্রথম সংখ্যার পাতাগুলো। এক সময় মজা করে লোকে বলতো ঢাকা শহরে যত কাক ততই কবি। কে জানতো সেই কবিদের একটা বড় অংশের বসত আমাদের অবনী টেক্সটাইলে। সবচে বেশী লেখা পেয়েছি ওখান থেকেই।

আমরা সতর্ক থেকেছি মনোনিত লেখার মৌলিকত্বের ব্যাপারে। কিছু কিছু লেখা নিয়ে রীতিমত গর্ব করা যায়। দু-চারটে লেখার থীম বা বিষয় বস্তু ভাল হওয়া সত্ত্বেও কাঠামোগত দুর্বলতা থাকার কারণে সেগুলোকে একটু ঘসে-মেজে দিতে হয়েছে। আর এই কঠিন কাজটি করেছে সোনিয়া।

এই সংখ্যার কলেবর অত বড় নয়। কাজেই মনোনিত সব লেখার স্থান সংকুলান হয়নি এতে। মন খারাপের কিছু নেই। বর্তমান প্রকাশনাটি প্রথম হলেও শেষ নিশ্চয় নয়। যাদের লেখা খুব মান সম্মত হয়নি তারা হতাশ হবেন না। অবিরত চেষ্টার ফলে যদি সেলাই-এর মান ভাল হয় তো একই ভাবে লেখাও ভাল হবে এক সময়। শুধু চেষ্টাটা চালিয়ে যেতে হবে।

বকবকানি আর নয়। শেষ করবার আগে ব্যাবিলন কথকতা এর সাথে সরাসরি ও নেপথ্যে যারা কাজ করেছেন তাদেরকে আবারো ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ ব্যাবিলন পরিবারের সবাইকে- যাদের উদ্দেশ্যে এই প্রচেষ্টা নিবেদিত। আপনাদের সবার মূল্যায়ন আমাদেরকে এই উদ্দ্যোগ বহমান রাখতে উৎসাহিত করবে।

ইংরেজী নববর্ষ ও ঈদুল আয্হার শুভেচ্ছা সবাইকে।

* এমদাদুল ইসলাম, পরিচালক, বিপণন ও মান নিয়ন্ত্রণ

তারিখ- ১৬ই ডিসেম্বর ২০০৬

পরিচালকের বাণী

নিসার আহমেদ

প্রথমবারের মত ব্যাবিলন পরিবার একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করছে জানতে পেরে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। এটি প্রথমবারের মত হলেও তা নিশ্চয় শেষবারের মত নয়-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দিপণা দেখে তাই আশা করছি। এর উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় যারা ছিলেন তাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিচালকের বাণী

মইনুল আহসান

পোশাক শিল্পের ব্যস্ততম পেশাদারী জীবনের মাঝেও ব্যাবিলন কথকতা নামক ম্যাগাজিন প্রকাশনায় যারা সাহস করেছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ব্যাবিলন কথকতার দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

পরিচালকের বাণী

আবিদুর রহমান

ব্যাবিলন পরিবারের পক্ষ থেকে ব্যাবিলন কথকতা নামক একটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অবাক ও আনন্দিত হয়েছি। ম্যাগাজিন সংকলন র এই ধারা অব্যাহত থাকুক সেই প্রত্যাশা করছি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ ।

পরিচালকের বাণী

আব্দুস সালাম

ব্যাবিলন কথকতা নামক একটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত । অত্যন্ত খুশী হয়েছি এটা জেনে যে, এতে যারা লেখা দিয়েছেন তারা সকলেই ব্যাবিলনের সদস্য। এই ম্যাগাজিনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এর সাফল্য কামনা করছি ।

ব্যাবিলন কথন

এমদাদুল ইসলাম
পরিচালক মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন, ব্যাবিলন গ্রুপ

মহাবিশ্বের সৃষ্টি বা জন্ম আমরা কেউ প্রত্যক্ষ করিনি। আর তাতে করে সমস্যাটাও জটিল হয়েছে। যুগ যুগ ধরে তাবৎ বিজ্ঞানীদের গবেষণা চলছে কবে এবং কিভাবে এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড জাত হলো। ফলশ্রুতিতে এরই মধ্যে বিবিধ তত্ত্ব ও মতের প্রকাশ ঘটেছে এই বিষয়ে। কিন্তু নিঃসন্দেহ হওয়া যাচ্ছেনা কোনটির বিষয়েই। তা সাড়ে-চারশ, পাঁচশ কোটি বছর আগে যেই যজ্ঞ সুচীত হয়েছিল বলে মনে করা হয় তা নিয়ে খনিকটা গোল বাঁধতেই পারে। কিন্তু ব্যাবিলন?

না, মেসোপটেমিয়ার ব্যাবিলন নয়। আমাদের প্রিয় ব্যাবিলন গ্রুপের কথাই বলছি। পাঁচশ কোটি বছর বা পাঁচ হাজার বছর আগের কথা নয়। মাত্র বিশ-একুশ বছরের ইতিহাস। তাও মানুষের মনতো। স্মৃতি থেকে কিছু হারিয়ে যেতেই পারে। লেগে যেতে পারে তাতে কিছু বাড়তি রং। অনেক ক্ষেত্রে রং (Colour) লাগা রং (Wrong) নয়। তবে রঙিন ইতিহাস কাম্য হলেও রাঙানো ইতিহাস কাম্য নয়। কাজেই তেমনটি হওয়ার আগেই ব্যাবিলনের সৃষ্টি কাহিনীর কিছুটা বলে ফেলা যাক। তবে এই স্বল্প পরিসরে সুবিস্তারে তা বলার সুযোগ নেই।

আজকের ব্যাবিলন পরিবারের অনেকেই বোধ হয় জানেন ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ দিয়েই এই গ্রুপের যাত্রা শুরু ১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাসে। তবে যা অনেকেই জানেননা তা হলো ব্যাবিলন গার্মেন্টস এর জন্ম কিন্তু হয়েছিল ১৯৮৪ সালে ভিন্ন উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে।

সেই বছরই অর্থাৎ ১৯৮৪ সনে ঢাকার শান্তিনগরস্থ একটি রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে যোগ দিয়েছি আমি প্রডাকশন ম্যানেজার হিসেবে। ওখানে থেকে পরিচয় হলো সদ্য প্রতিষ্ঠিত আরেকটি গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান দি ইয়ক (The Yolk) গার্মেন্টস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম মুর্শেদের সাথে। সাধারণ পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব হতে সময় লাগেনি। সময় লাগেনি মুর্শেদ ভাইয়েরও সিদ্ধান্ত নিতে। ইয়ক গার্মেন্টস তাঁর স্বপ্ন প্রকল্প (Dream Project) হয়নি-তিনি মনে করতেন। কাজেই চাই নতুন নতুন উদ্যোগ-তার সংগে চাই এমদাদ ভাইকে অর্থাৎ আমাকে।

মুর্শেদ ভাই যখন আমার কাছে প্রস্তাবটি রাখলেন তখন আমি Astras Garments Ltd. এর উৎপাদন ব্যবস্থাপক। ১৯৮৫ সাল সেটা। অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব-এবং অবাস্তবও বটে আমার জন্য। বিনিয়োগ করার মত টাকা কই আমার কাছে? একটুও চিন্তা করবেন না-শুধু আপনি এলেই হবে। টাকা জোগাড় হয়ে যাবে। ব্যাংক লোন পেয়ে যাবো। আশ্বাস দিলেন মুর্শেদ ভাই। উনার প্রবল ইচ্ছা ও সংকল্প আমার সম্মতি আদায় করে নিল প্রায় অনায়াসেই।

একে একে পরিচয় হ'ল ফরহাদ ভাই (প্রয়াত), নান্নু ভাই (মইনুল আহ্সান), মোহাম্মদ ওসমান প্রমুখের

সাথে। সাব্যস্ত হলো 'সুন্দর কনসোর্টিয়াম' নামে একটি কোম্পানি হবে আমাদের। সুন্দর কনসোর্টিয়াম প্রথমে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করবে। পরে আস্তে আস্তে অন্যান্য প্রকল্প গ্রহন করা হবে।

সময় বয়ে যায়, ঘন ঘন মিটিং হয়- কিন্তু ব্যাংক লোন আর হয় না। মুর্শেদ ভাই এতে দমবার পাত্র নন। ঋণ ছাড়াই আমরা শুরু করব।

পুরনো ঢাকায় একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির খোঁজ পাওয়া গেল। বিক্রি হবে। দেখতে গেলাম দল বেঁধে। না হলোনা। সাধ্যের বাইরে দাম। এমন সময় রামপুরায় এক কোম্পানির কাছে কিছু সেলাই মেশিন পাওয়া গেল একদম নতুন অবস্থায়। যতদুর মনে পড়ে আটটা প্লেইন মেশিন ও ছয়টা ওভারলক মেশিন আমরা কিনলাম। ব্যাবিলনের বর্তমান ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর জনাব মইনুল আহ্সান (আমাদের নান্নুভাই) সাহেবদের একটি মার্কেট বিল্ডিং আছে নিউ এলিফ্যান্ট রোডে। উনার একটি অফিস ছিল ঐ বিল্ডিঙের উপরতলায়। সেখানেই একটা রুম খালি করে মেশিনগুলো এনে রাখা হলো। এখানে উল্লেখ্য এই মেশিন কেনার অর্থায়ন হয়েছিল নান্নু ভাইদের পরিবার থেকে ঋণ করে। যা হোক সেই মেশিনও পড়ে থাকল। আর কোন মেশিনও কিনতে পারিনা। ব্যাংক লোন ও হয় না।

ব্যাবিলন গ্রুপের পরিচালক নিসার আহমেদ তখন (Astras Garments)-এর ফ্যাক্টরি ম্যানেজার। চট্টগ্রামের 'দেশ গার্মেন্টস' থেকে তিনি আমার সহকর্মী ও বন্ধু। আমার সাথে মুর্শেদ ভাইয়ের পরিচয়, পরে ব্যবসার প্রস্তাব, সুন্দর কনসোর্টিয়াম গঠনের আইডিয়া-এগুলো সবই উনি জানতেন। এও জানতেন আমরা উদ্যোগের শুরু থেকেই খোঁড়াচ্ছি। এখানে বলা দরকার নিসার সাহেব Astras-এ চাকুরিরত অবস্থায় অন্য উদ্যোক্তাদের সাথে একটি দু-লাইনের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে অংশীদার হন। ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ নামে ফ্যাক্টরিটি গ্রীণরোডস্থ একটি চারতলা বসতবাড়ীতে ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাবিলন গার্মেন্টস তখনো কোন সরাসরি অর্ডার পায়নি। সম্পূর্ণ সাব-কন্ট্রাক্ট নির্ভর ছিল ফ্যাক্টরিটি। ঐ সময়ে নিয়মিত সাব-কন্ট্রাক্ট পাওয়াও খুব কঠিন ছিল। কাজেই ব্যাবিলন প্রায়ই কর্মহীন থাকত।

আমরা যখন কনসোর্টিয়াম নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি তখন ব্যাবিলনের মালিকরা ভাবছেন ফ্যাক্টরিটি বিক্রি করে দিতে পারলে বাঁচা যেতো। নিসার সাহেবের কাছ থেকে এই রকম একটা আভাস পেয়ে আমরা সুন্দর কনসোর্টিয়ামের সবাই উৎসাহী হয়ে পড়ি। প্রস্তাব চলে যায় ব্যাবিলন মালিকদের কাছে। এই সময় সংগত কারনেই আমাদের মনে হয় ব্যাবিলনের সাথে নিসার সাহেব চলে এলে আমাদের দারুন লাভ হয়। Astras Garments এর ব্যবস্থাপনা ছাড়াও ওনার রয়েছে দেশ গার্মেন্টস-এ মেনটেন্যান্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কাজ করার অভিজ্ঞতা।

আকর্ষণীয় মূল্যে ও সহজ শর্তে তা পরিশোধের আশ্বাস সহ ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ আমাদের হলো। ১৯৮৫ সনের শেষ দিকের কথা এটা। গ্রীন রোডের চারতলা বাড়ীর পরিসরে রেখে ব্যাবিলনকে স্বাচ্ছন্দে চালানো যাবে না। এটা আমরা ভেবেছিলাম। কাজেই নতুন জায়গা খোঁজার পালা। মিরপুরের ৬নং সেকশনের দীর্ঘকাল বসবাসকারী আমার এক আত্মীয়ের (পরাগ ভাই) সহায়তায় খুঁজে পেলাম তখনকার হিসেবে

আমাদের জন্য খুবই উপযোগী একটা ফ্যাক্টরী ফ্লোর। পূরবী সিনেমার পার্শ্ববর্তী পূরবী মার্কেটের চারতলায় ব্যাবিলন গার্মেন্টস এর পূণর্জন্ম হলো। মনে আছে ১৯৮৬ সালের এপ্রিল নাগাদ আমরা সেখানে ফ্যাক্টরি সাজিয়ে ফেলেছি।

এখানে আবার একটু পিছনে ফিরে যেতে হয়। আমি যখন শান্তিনগরে কনজুমার প্রোডাক্টস লিঃ এ প্রডাকশন ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত তখন কাজের মাধ্যমে পরিচিত হই কিছু বায়িং হাউস ও ক্রেতার সাথে। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল তাইওয়ান ভিত্তিক Kex International ও আমেরিকান বায়িং হাউস Melcher & Landau । Kex International এর কর্ণধার ছিলেন Mr. Gary Kao; আর এর ঢাকাস্থ প্রধান ছিলেন মিঃ জাফর ওসমান (বর্তমানে ITC বা International Trade Connection এর জাফর ওসমান একই ব্যক্তি)। Key International এর Gary Kao, মিঃ জাফর ওসমান এবং Melcher & Landau এর শ্রীলংকান বড় কর্তা মিঃ সুরেন সিনাদুরে (Suren Sinnaduray) এর কাছে আমার তথা ব্যাবিলনের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। অবিশ্বাস্য সহযোগিতা আমরা পেয়েছি এদের কাছ থেকে আমাদের ভীষণ দুঃসময়ে। Gary এবং Suren আমাদেরকে বড় অংকের অর্ডার নিশ্চিত করেছেন ফ্যাক্টরি দর্শন না করেই। আমার ধারণা এ রকম বদান্যতা নজীর বিহীন।

আজকেও ভাবলে মজা পাই-আবেগ তাড়িত হয়ে সেই সময় আমরা Kex International এর ওসমান ভাইকে আমাদের কোম্পানির অংশীদার বানিয়ে ফেলি মুখে মুখে। সদা বিনয়ী এবং ভীষণ ভদ্র এই ভাল মানুষটি অবশ্য কখনো সেই শেয়ার দাবী করেননি-কিন্তু করার অধিকার ওনার ছিল।

আজকে অনেকেরই হয়তো জানা নেই ওভেন (Woven) শার্ট মেকার হিসেবে খ্যাত ব্যাবিলনের যাত্রা শুরু হয় Knit Garment তৈরী দিয়ে। Kex International এর প্রথম অর্ডারটি ছিল বেশ বড়। Jogging Set ও ভিন্ন ভিন্ন Top ও Bottom মিলিয়ে পাঁচটি Style Knit কাপড়ে। কাপড় ও আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদি এসেছিল তাইওয়ান থেকে।

আমরা প্রায় বছর খানেক Knit Order করেছি। ক্রেতা Kex International, Melcher & Landau, Parthenon প্রমুখ। আমাদের Knit Garment এর ব্যবসা খুব সুখকর হয়নি। ঐ দিন গুলোতে ফ্যাক্টরির জন্য অভিজ্ঞ মেশিন অপারেটর বা সুপার ভাইজার বলতে গেলে পাওয়াই যেতোনা। প্রডাকশন ম্যানেজার নিয়োগের চিন্তাও করিনি- কারন তা ছিল সামর্থের বাইরে। ফ্যাক্টরিতে প্রডাকশন ম্যানেজার, কোয়ালিটি ম্যানেজার, মেশিনের সাধারন রোগ সারানোর মেকানিক বলতে আমিই ছিলাম। নিসার সাহেব ব্যাংক-কাস্টমস-এর কাজ সেরে সন্ধ্যার দিকে ধুলো-মলিন চেহারা নিয়ে ফ্যাক্টরিতে আসতেন মেশিনের জটিল রোগ গুলো সারতে। উনি ছিলেন ব্যাবিলন গার্মেন্টস এর স্বীকৃত প্রথম মেকানিক।

এবার একটা মজার কথা জানাই আপনাদেরেকে। ১৯৮৭ সালের কোন এক সময়। তখন আমরা Knit Garment তেমন একটা করিনা। Kex International এর Gary Kao এসছেন একদিন ব্যাবিলন ফ্যাক্টরি পরিদর্শনে। ফ্লোরে হাটতে হাটতে একসময় তাঁকে জিজ্ঞেস করি আমাদের প্রথম অর্ডারটি কেমন বিক্রি হয়েছে। উনি একটু মুচকি হেসে বললেন ঐ শিপমেন্টের বেশির ভাগ মালতো এখনো গোডাউনেই পড়ে আছে।

খুব বাজে প্রডাক্ট পাঠিয়েছিলে এমদাদ! বুঝুন এবার। ব্যাবিলনের উষা লগ্নে এমন মহানুভব বায়ারদেরকে না পেলে আজকে আমরা হয়তো আকাশে সন্ধ্যাতারা হয়ে ঝুলে থাকতাম। সেই দিনগুলোতে বায়ারদের অসাধারন সাপোর্ট আমরা আরো পেয়েছি। পরে বলছি সে কথা।

ব্যাবিলনের মতই হাত বদল হয়ে সুরভী গার্মেন্টস লিঃ আমাদের হয়ে যায় ১৯৮৭ সনে। নিউ এলিফ্যান্ট রোডে মূল মালিকরা ফ্যাক্টরিটিকে চালিয়ে ছিলেন কিছুকাল। ভাল চলেনি তাই সুরভীকেও নতুন ঠিকানা খুঁজে নিতে হয়েছে। সুরভী গার্মেন্টস এর মেশিনগুলো ছিল বেশ পুরনো ও সস্তা ব্রান্ডের। কাজেই সুলভেই ফ্যাক্টরিটি কিনতে পারি আমরা। এদেরও ছিল প্রায় দু'লাইনের মেশিন। প্রজেক্টটি ছিল Knit এর কাজেই ওভারলক মেশিন ছিল বেশ কটা। যাহোক ব্যাবিলন-সুরভী ভাই-বোন হয়ে একই ছাদের নিচে চার লাইনের ফ্যাক্টরি হয়ে চলতে লাগল মিরপুরে।

প্রায় একবছর Knit এর কাজ করে Woven এ উত্তরন- মনে আছেতো? তা সেই ক্রান্তিকালটা মনে আছে বেশ। বলিনি বোধ হয় আমাদের ঠিক নিচের ফ্লোরে ছিল ডেকো গার্মেন্টস লিঃ। শার্ট ফ্যাক্টরি ডেকোর যাত্রা শুরু ১৯৮৪ সন থেকে। ডেকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব শাহাদাত হোসেন কিরন আবার আমাদের তৎকালিন ম্যানেজিং ডিরেক্টর গোলাম মুর্শেদ ভাইয়ের বোনের হাজব্যান্ড। এই আত্মীয়তার সুবাদে ডেকোর সাথে শুরু থেকে আমাদের বিশেষ ঘনিষ্টতা। কিরন ভাইয়ের ছোট ভাই শহিদ হোসেন বা শহিদ ভাইয়ের সাথে পরিচয় ফ্যাক্টরি চালু করার সাথে সাথে হয়নি। ঐ সময়টিতে শহিদভাই বিদেশ সফরে ছিলেন।

প্রথম পরিচয়েই ভীষণ বন্ধুবৎসল ও দারুন সদালাপী শহিদ ভাই আমাকে আপন করে নিলেন। বললেন-কোন চিন্তা নেই। শার্ট করবেন? আমি দিচ্ছি কাজ। তা-এমনতো অনেকেই বলেন কিন্তু পরে তা ভুলে যান। কিন্তু শহিদ ভাই ভোলেননি।

ব্যাবিলন গার্মেন্টস এর প্রথম শার্ট-এর কাজ আসে ডেকোর ফ্লোর থেকে-Sub Contract । কোরিয়ান বায়িং কোম্পানি KI-ON TRADING -এর একটা পলি-কটন ৮০/২০ Dobby Stripe কাপড়ের শার্ট। আজো মনে আছে পরিষ্কার-যাতে আমাদের লাইন বসে না থাকে সেই জন্যে শহিদ ভাই প্রায় ৮০০ পিস এর মত শার্টের কাটা মাল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেলাই করার জন্য। আমরা সবাই দারুন খুশী-রীতিমত উত্তেজিত। আমার উত্তেজনাটাই বেশী। অনেকদিন পরে শার্ট পেয়েছি-যেটা আমি তুলনামূলক ভাবে ভাল বুঝি। ৮০০ পিস শার্ট প্রায় দশ দিন ধরে বানালাম। বা বলা উচিৎ বানাবার চেষ্টা করলাম। কাপড়ে শেড্ ছিল বেশ। সেলাইয়ের সময় পদে পদে সাবধানতার দরকার ছিল। আমি আজো জানিনা ঐ ৮০০ পিস শার্টের অর্ধেকটাও শহিদ ভাই Ship করতে পেরেছিলেন কিনা। কিন্তু আমাদেরকে পয়সা দিয়েছিলেন পুরোটাই।

ডেকো তথা শহিদ ভাইয়ের কাছে ব্যাবিলনের ঋণ অপরিমেয়। শহিদ ভাইয়ের জোড়ালো সুপারিশের কারনে অল্পকাল পরেই KI-ON TRADING -এর কাছ থেকে সরাসরি অর্ডার পেয়ে যাই আমরা। শার্টের অর্ডার ইউরোপের জন্য। এছাড়া ডেকোর মাধ্যমে ফরাসী ক্রেতা Longel-এর অনেক শার্টের অর্ডার পায় ব্যাবিলন।

১৯৮৭ সালের একসময় জনাব আবিদুর রহমান অর্থাৎ আমাদের আবিদ ভাই ব্যাবিলন পরিবার ভুক্ত হন।

দীর্ঘকাল আমেরিকায় প্রবাসী থাকার পর বাবার মৃত্যু উপলক্ষ্যে দেশে ফিরে আসেন। এরপর আর ফিরে যাওয়া হয়নি বিদেশে। ব্যাবিলন তখন নিদারুন অর্থকষ্টে। ঐ সময়ে আবিদ ভাইয়ের অন্তর্ভূক্তি ব্যাবিলনের যাত্রাপথকে অনেকটাই মসৃণ করেছে।

১৯৮৮ সনে KI-ON TRADING থেকে বেরিয়ে এসে Mr. Koo, Young International নামে একটি নতুন বায়িং কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। Young International এ এসে যোগ দেন KI-ON TRADING-এর Mr. H.Y. Lee ও Mr. Aan। Young International এর প্রথম অর্ডারটিই পায় ব্যাবিলন। Buyer ছিল ফ্রান্সের Somotex। এখানে উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে যে ব্যাবিলনের সাফল্য ও বিস্তৃতির জন্য যে সব বায়িং প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বিশেষের কাছে আমরা চির ঋণী তাদের অন্যতম হচ্ছে M/S.Young International এবং Mr. Koo ও Mr. H.Y. Lee (যাকে আমরা বড় ভাই বলে ডাকি)।

শুরু থেকে প্রায় ১৯৮৯ সন পর্যন্ত চারটি বছর ছিল অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের বছর ব্যাবিলনের জন্য। ১৯৮৮ সালে ছিল দেশজুড়ে ভয়াবহ বন্যা ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের বছর। এই কঠিন সময়গুলো পার করতে ও টিকে থাকার লড়াইয়ে নুয়ে না পরতে যাদের ত্যাগ ব্যাবিলন আজীবন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে তারা হলেন- মোঃ আমজাদ হোসেন বুলবুল, আলী আজগর, সোলাইমান আলী, লিয়াকত আলি খান, এস,কে,জামান, আবদুল হাই, জনাব শামছুদ্দোহা, মতিউর রহমান, কেরামত আলী প্রমুখ। এর বাইরে স্থানীয় সমস্যা নিরসনে পরাগ ভাই ও চলন্তিকা ক্লাবের সহযোগিতা অবশ্য স্মরণীয়।

পূরবী সিনেমা হল ও পূরবী মার্কেটের মালিক মুশফিকুর রহমান ভাইয়ের কথা এখানে আবশ্যক ভাবেই উল্লেখ করতে হয়। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা ও সাহায্য না পেলে ব্যাবিলনের চলার পথ আরো অনেক দুর্গম হতো।

আমাদের সবার অতি প্রিয় সালাম স্যার (আব্দুস সালাম শিকদার) ব্যাবিলনের সদস্য হলেন ১৯৯১ সালে। এর আগে প্রায় চার বছর কাজ করে এসেছেন ছবির মত দেশ সুইজারল্যান্ডে। সালাম সাহেবের অন্তর্ভূক্তির ফলে জন্ম নিল নতুন আরেকটি শার্ট ফ্যাক্টরি ল্যাপিন ড্রেসেস-এর (Lapin Dresses নামটি এখন আর আমাদের নেই)। প্রথমে দুই ও পরে আরো এক লাইন যোগ হয়ে ল্যাপিন ড্রেসেস লিঃ যিতু হ'ল পূরবী সিনেমার পেছনের বর্ধিতাংশে।

১৯৯০ সালে এসে আমরা বুঝেছি টিকে থাকার লড়াইয়ে আমরা বিজয়ী হয়েছি। এবারে শুধু এগিয়ে যাওয়ার পালা। ভাল শার্ট প্রস্তুতকারী হিসেবে অল্প-বিস্তর নাম হয়েছে তখন আমাদের। যুক্তরাজ্যের আমদানিকারক David Howard Company আমাদেরকে খুঁজে পায় ১৯৯১ সনে। বাংলাদেশে তাদের উপস্থিতি আরো কিছুকাল আগে থেকে। ব্যবসা বেড়ে যাওয়ায় ভাল ও নির্ভরযোগ্য আরেকটি ফ্যাক্টরী খুঁজছিল তারা। Victor Rawlinson (D.H. এর Managing Director) -এর কাছ থেকে অনুরোধ পান SGS-এর মোমিন ভাই ফ্যাক্টরি খুঁজে দেবার। মোমিন ভাইয়ের সুপারিশে Victor Rawlinson একদিন আসেন ব্যাবিলন দর্শনে। ফলশ্রুতিতে তাৎক্ষনিকভাবে ব্যাবিলন পায় ১৫০০০ পিসের এক ফর্মাল শার্টের অর্ডার। এই ট্রায়াল অর্ডার শিপ না হতেই ব্যাবিলন পেয়ে যায় চলমান শার্টের অর্ডার সামনের মাসগুলোর জন্য।

David Howard এর মাধ্যমে দীর্ঘকালের জন্য ব্যাবিলনের শার্ট কাস্টমার তালিকায় যোগ হয়–Burton, Debenham, Tesco, River Island, BHS এর মত নামী দামী ব্রান্ডের।

অল্প সময়ের ভেতরে কোয়ালিটি ও কমিটমেন্টের দিক থেকে ব্যাবিলনকে মাঝারি কাতার থেকে উপরের সারিতে ঠেলে তোলার ব্যাপারে David Howard কোম্পানির ভূমিকা ছিল সুবিশাল।

সূচনা লগ্নে ব্যাবিলনের টিকে থাকা ও তৎপরবর্তিকালে ব্যবসা প্রসারের ব্যাপারে অনুরুপ ভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা, ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্য ও অন্যান্য শুভাকাঙ্খীদের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংক, বাংলাদেশ স্থানীয় শাখা (যেখানে ব্যাবিলন দায়বদ্ধ)–এর অসামান্য সহযোগিতা ও আশ্রয় প্রশ্রয়–এর গুরুত্ব ভাষায় প্রকাশ যোগ্য নয়।

সময়ের পথ বেয়ে ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ যেমন একক ফ্যাক্টরি অবস্থান থেকে গ্রুপ অব ফ্যাক্টরিজের মর্যাদায় আসীন হয়েছে তেমনি এসেছে এর পরিচালনা পর্ষদের ভেতরে পরিবর্তন। সুরভী গার্মেন্টস–এর পুরনো পরিচালকরা তাঁদের শেয়ার ছেড়েছেন–চলে গেছেন মোহাম্মদ ওসমান ব্যাবিলন ছেড়ে। তবে সবচে বড় ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনটি হয়েছে ১৯৯৬ সনে। ব্যাবিলন গার্মেন্টস–এর প্রতিষ্ঠাতা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জনাব গোলাম মুর্শেদ নিজেকে অবমুক্ত করেন ব্যাবিলন থেকে এই সালে। এর আগে আমাদের সবার প্রাণপ্রিয় পরিচালক ফরহাদ ভাই দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নেন ১৯৯৪ সালের ২রা মে লন্ডণে। ব্যাবিলনের পত্তন ও প্রসারে ফরহাদ ভাইয়ের অত্যন্ত দৃঢ় ও সফল ভূমিকা আমরা কখনো ভুলতে পারবোনা।

১৯৯৬ সালের ঐ বিশাল ওলট–পালটের পরে ব্যাবিলনের যেন নব জন্মই হলো। পরিবর্তিত পরিস্থিতির কিছু ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা মাথায় করে আমরা পাঁচজন নতুন সংকল্প নিয়ে আরেকবার ঝাঁপিয়ে পড়লাম সমরে। এর পরের ইতিহাস সাম্প্রতিক এবং মোটামুটি সবারই জানা। ব্যাবিলনের নিজস্ব ভবন তৈরী, অবনী টেক্সটাইল ও অবনী নিটওয়্যার প্রতিষ্ঠা, প্রিন্টিং, প্যাকেজিং ও গার্মেন্টস ওয়াশিং ফ্যাক্টরির আত্মপ্রকাশ এগুলো খুব বেশী দিনের কথা নয়।

বর্তমানে প্রায় ৭০০০ শ্রমিক–কর্মচারী–কর্মকর্তা সমৃদ্ধ ব্যাবিলন গ্রুপের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে–ব্যাবিলন গ্রুপ দেশের রেডিমেড গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল সেক্টরের জন্য একটা অনুসরণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

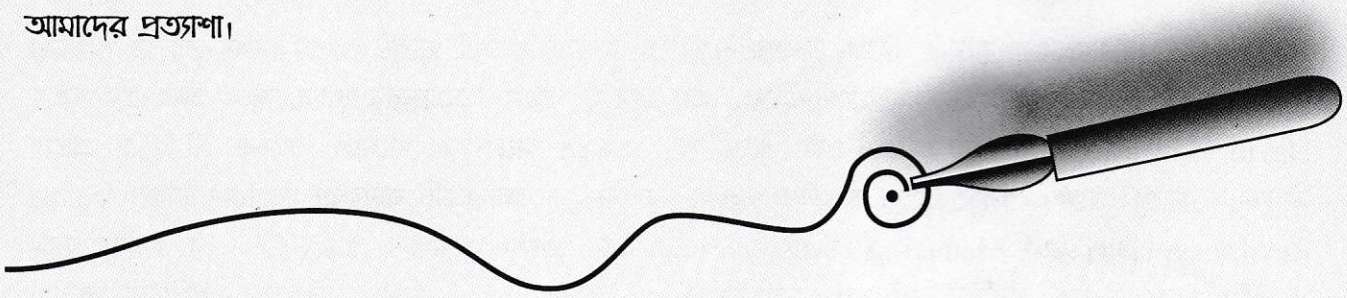

কানা বগীর ছা

মোঃ মনিরুল ইসলাম
কাটিং সহকারি, সেকশন ঃ কাটিং, পিন নং-১০৩৩৪

ঐ দেখা যায় সংসদ
ঐ নেতাদের গাঁ।
ঐ খানেতে বাস করে
কত্তো নেতার ছা।

ও নেতা তুই চাস কি?
দেশ ও দেশের উন্নতি।
দেশ ও দেশের উন্নতি চাইনা।
নিজের সুযোগ পাইনা।
একটু যদি পাই
অমনি তখন পোটলা বেঁধে
বাড়ি নিয়ে যাই।

খুকু মনি

মোঃ হুমায়ন কবির
জুনিয়র অফিসার, নিটিং বিভাগ, পিনং নং-০৬

খুকু মনিদের দেখার জন্য কারো মনে ইচ্ছা জাগে
সখিপুরে আছে ওরা দেখার কেউ যদি থাকে,
বাড়ি ঘর নেইতো তাদের থাকে কুড়ে ঘরে
ঝড়-বৃষ্টি এলেই ওদের কাঁপুনি ওঠে জ্বরে,

দুঃখ কষ্টের বেড়া জালে ক্লান্ত অবসরে
এভাবেই কাটে ওদের জীবন, রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে।
ক্ষুধার জ্বালায় অসুস্থ্যতায় বাস্তবে কংকাল
হেরে গেছে জীবন যুদ্ধে, মৃত্যু বাকি আর।।

বিশটি বছর

মোঃ আহসান হাবীব
পিন নং : ২০৪৪৮

হাতটি মাথার তলে দু-নয়ন মেলে
একটু অলস হয়ে নীরবে,
ভাবছি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মেঘরাশি আকাশে
চোখে ঢোকা পোকাগুলো উড়ছে হিমেল বাতাসে।
কেটেছে জীবন থেকে বিশটি বছর
হাসি আনন্দ কান্না জড়ানো কতনা প্রহর।

কখনও শরীর ভার, কখনও বা মন ভার
কখনও বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর
কখন ও বা মায়ের ভালবাসার কোমল চড়
গালে মেখে কেটেছে জীবন।
ফেলে আসা স্মৃতিমালা আজও বেঁচে আছে
হয়তো বেঁচে থাকবে হৃদয়ের ভিতর।

স্কুল পালিয়ে বন্ধুদের দলে
মনের ভয় তাড়িয়ে সিনেমা হলে
আবার বৈশাখে ছুটে চলা দল বেধে রমনা বটমুলে।
এখনও বিদ্যালয়ের ঘন্টা শুনি
পরিচিত বন্ধুরা দেখা দেয় একটু খানি
যদিও যায়না ফেরা ঐ জীবনে
বিশটি বছর বেঁচে রবে মনের বনে।

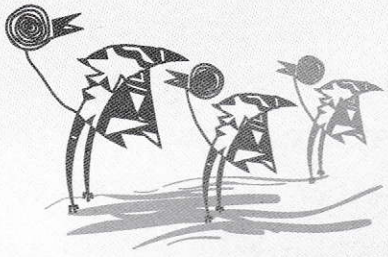

বিদায় বাণী

-এ,কে,এম, গোলাম মহ্হী চৌধুরী
সিনিয়র অফিসার, হেড অফিস

আজ চৈত্রের খরতাপে
বৈশাখের আগমনী গান
বারে বারে বেজে ওঠে
অপরূপা বসন্তের
দিন বুঝি হল অবসান।

উন্মাদ মৌসুমী হাওয়া
হিমালয় থেকে যেন ধার করে এনেছিল
এক ফালি ঘন কালো মেঘ।
সুনীল আকাশ পটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল
তার সেই গভীর আবেগ।
সন্ধ্যার আঁধার আর ঝিরি ঝিরি বৃষ্টির সাথে,
সেই চেনা সুর লয় তান।
উত্তাল বৈশাখী স্রোতে
বসন্তের দিন বুঝি হল অবসান।

হে কোকিল, বেলা হল ঢের,
ফুরালো সময়, নিভৃত বন বাসে যেতে হবে ফের।
যত দূরে যাবে যেও, শুধু প্রাণে গেঁথে নিও,
নীরব কবির সাথে কথা বলা এটুকু সময়,
অন্তরের অন্তঃস্থলে স্মৃতিটুকু রেখো অম্লান।
হোকনা বসন্ত গত, সহস্র বছর অবসান।

প্রিয় কর্মসংস্থান

সুজন, লাইন-৯

তোমাকে চাই, হে ব্যাবিলন
আমরা তোমাকে চাই।
বাংলাদেশের কোনায় কোনায়
তোমায় যেন পাই।

মোদের সকল চাওয়াগুলি
কর তুমি পূর্ণ।
তাইতো মোরা, এই জীবনটা
তোমার জন্য করতে পারি চূর্ণ।

তোমার মাঝে খুঁজে পাই
সকল আশার আলো
তাইতো তুমি মোদের প্রিয় কর্মস্থল
কাজে কাজে জীবন যখন
ক্লান্তি ঘিরে ফেলে
খেলাধুলা, গান বাজনায়
জীবন খুঁজে পাই।

সুখে দুঃখে এমনি কোরে
থেকো চিরদিন
গর্ব করে বলতে পারি
ব্যাবিলন তুমি মোদের প্রিয় কর্মস্থল।

একজন জরিনার জীবনকথা

সোনিয়া ইসলাম (রিতু)
প্রাক্তন ওয়েলফেয়ার অফিসার

আমার নাম জরিনা, লেহা পড়া কিছু জানিনা তয় নাম সই করতে পারি। আমার বাপে কামলার কাজ করে। ভিটায় দুইচালা এ্যাকখান ঘর ছাড়া আমাগো কোন জমি জিরাত নাই। আমরা আটটা ভাই-বোইন। বাজানের একলার কামাইয়ে তিন বেলাতো দুরে থাইক, আমাগো এ্যাক বেলাই খায়োনের জোগাড় হয়না। ক্ষিদার বড় জ্বালাগো।

ভাই বইনের মইদ্যে আমার গার রং একটু ফর্সা আছিল। তাই প্যাডের ক্ষিদা ছাড়া কিছু বোঝনের আগেই বড় দুই বইনেরে বাদ দিয়া বাজান আমারে এক রিক্সাআলার লগে বিয়া দিয়া দিল। সেই রিক্সাঅলার ঘরে ভালাই আছিলাম। তিন বেলা প্যাট ভইরা খাইতে তো পাইতাম। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আমি মা হইলাম। মাইয়াডারে নিয়া দিন ভালাই কাটতেছিল। হটাৎ একটা ঝড় আইস্যা-আমার সব কিছু ভাইঙ্গা-চুইরা দিয়া গ্যালো। আমার স্বামী রিক্সা চালাইতে গিয়া বাসের লগে ধাক্কা খাইয়া মইরা গ্যালো। সংসার বোঝনের আগেই আমি বিধবা হইলাম। মাইয়াডারে কোলে লইয়া বাপের বাড়ি চইলা আইলাম। খায়োনের মুখ বাড়ল।বাজানের মাথায় য্যান আকাশ ভাইঙ্গা পড়ল। আবার শুরু হইল ক্ষিদার জ্বালা। আগেতো প্যাড আছিল একটা, এহন হইছে দুইডা। মাইয়াডা দুধ পায়না, সারাদিন ট্যা ট্যা কইরা কান্দে। টাহাও নাই যে দুধ কিন্যা খাওয়ামু। কি যে কষ্টের মইদ্যে দিন যাইতেছিল, মাঝে মাঝে মনে হইত মাইয়াডারে কোলে নিয়া গাঙ্গে ডুব দিয়া মরি। জীবনের এত মায়াগো হেইডাও করতে পারলাম না। যে জীবনে এত কষ্ট, প্যাডে ভাত জোটেনা, পরনের কাপড় হয়না, সেই জীবনের লাইগা এত মায়া ক্যান কইতে পারেন?

এই সময় হটাৎ যেন আকাশের চাঁন হাতে পাইলাম। আমাগো পাশের বাড়ীর রোজীনাবু ঢাকায় চাকরী করে। হে বাড়ীতে আইল। আমার কষ্ট দেইখ্যা আমারে কইল, জরিনা মাইয়াডারে তোর মার কাছে থুইয়া আমার লগে ঢাকায় চল। তোরে একটা কামে ঢুকাইয়া দিমু। রোজিনাবুর হাত ধইরা গেরাম থাইক্যা শহরে আইলাম।

শহরের জীবনই আলাদা। এইখানে রইতের বেলাও আন্ধার হয়না রাইত যেন দিনের চাইতেও ফকফকা। রোজিনাবু আমারে একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টুরীতে কামে ঢুকাইয়া দিল। হেইডারে কয় হেলপারের চাকরী। মাস গ্যালে ৭০০ টাকা দিব। এইখানে একলগে এতমানুষ কাম করে, এত মানুষ একলগে আমি আর আগে দেহিনাই। আমার জীবনও বদলাইয়া গ্যালো। রোজিনাবুর ঘরেই আমার থাকার ব্যবস্থা হইল। মাস গ্যালে থাকা-খাওয়ার লাইগ্যা ছয়শ টাকা দিতে হইব। আমি যে ফ্যাক্টরীতে চাকরী করি ম্যালা বড় ফ্যাক্টরী। এইখানে অনেক কাম। বেতন ছাড়াও আমি ওভার টাইমের টাকা পাই। এহন আমি থাইকা খাইয়াও বাড়িতে টাকা পাঠাইতে পারি। আমার মাইয়াডার এখন আর দুধের লাইগা কানতে হয়না।সব মিলায়ে এখন আমি ভালই আছি।

আমার কামের জায়গাটা খুব ভালা। এইখানে আমার মত অনেক জরিনারা কাম করে। বড় বড় স্যাররা আইসা আমাগো লগে কত ভালা ভালা কথা কয়। একবছরের মাথায় আমি হেলপার থাইকা মেশিন অপারেটর হইলাম। আমার বেতন বাড়ল। বাড়ীর থাইকা মাইয়াডা, লগে ছোট বইনডারে নিয়া আইলাম। এই ভাবে দিন ভালাই কাইটা যাইতেছিল। হটাৎ কইরা কেমন জানি সব ওলট-পালট শুরু হইয়া গ্যালো। নতুন নতুন অনেক স্যার ম্যাডামরা আইতে লাগল, তারা আইয়া আমাগো লগে ম্যালা কথা কইত। আমরা ঠিকমত বেতন, ওভারটাইম পাইকিনা, আমাগো কোন অসুবিধা আছে কিনা, আমাগো লগে কোন খারাপ আচারন করা হয়কিনা আরো ম্যালা ম্যালা কথা। মাঝে মাঝে রাগ ওইত আর হইবইবনা ক্যান কনতো, আমাগো তো গুইন্যা গুইন্যা প্রোডাকশন দেওয়া লাগে, আমাগো সময়ের দাম আছেনা। হেরা পাঁচটা কথা জিগাইলে দুইডা মিনিট হইলেওতো সময় নষ্ট হয়, হয় না কন!

অল্প কয়েকদিনের মইধ্যে ফ্যাকটরীর চেহারাটা কেমন বদলাইয়া গ্যালো। তয় ওহন আগের চাইতে ভালাই হইছে। ওহন হগ্যলের মাথার উপর ফ্যান ঘুরে, বাসা থাইক্যা খায়োনের পানি বইয়া আনন লাগেনা। যায়গায় যায়গায় আমাগো লাইগা খায়োনের পানির ব্যবস্থা করছে, আবার পানি খায়োনের লাইগ্যা হগ্যলেরে আলাদা আলাদা গিলাসও দিছে। দুফুরে খায়োনের যায়গার ব্যবস্থা করছে। এহন সপ্তায় দুইদিন কইরা ডাক্তারও আসে, আমাগো বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে। আবার শুনছি আমার মত যাগো ছোড ছোড বাচ্চা আছে তাগো বাচ্চা রাহারও ব্যবস্থা করা হইব। এতসব কিছু মাঝে মইধ্যে স্বপ্নের মত মনে হয়। মনে হয় চোঁখ খুললেই সব মিলায়ে যাইব।

এর মইদ্যে স্যারেরা একদিন আমাগো হগ্যলের নাম সই আর ফটো তুইল্যা নিয়া গ্যালো। এই গুলা নাকি আমাগো বেতনের লাইগ্যা লাগব। মনে মনে ভাবলাম এতদিনতো এইগুলান কিছুলাগেনাই তয় এহন লাগব ক্যাঁ। আবার এইডাও মনে হইল আগেতো এত সুযোগ সুবিধা আছিলনা। এহন এত সুযোগ দিছে এর লাইগ্যা লাগতেও পারে। এইসব ঘটনার মইদ্যে একদিন এক স্যার আইস্যা আমার পাশে দাড়াইল। আমার লগে ম্যালা কথা কইল। আমার বেতন কেমন, এত কাম করতে কষ্ট হয়কিনা, দরকার হইলে ছুডি পাই নাকি এইসব কথা। আমিও কইলাম কাজ করতে তো কষ্ট একটু হইবই তয় বিনা কামে পয়সা দিব কিডা। যে বাপে জন্ম দিছে হেই খাওয়াইতে পারেনা। এইহানে তাওতো কাম আছে। মাস গ্যালে বেতন পাই। খাইতে পারি, খাওয়াইতে পারি। আমি এহন অনেক ভালা আছি। হেরবাদে সেই স্যারে আমার বয়স কত জিগাইল। দেখতে শুনতে আমার গড়নডা ছোট আছিল তয় বয়সের হিসাবতো কোনদিন করিনাই। বিয়া হইছে, মা হইছি, চাকরি হইছে কিন্তু বয়সের কথাতো কেউ কোনদিন জিগায় নাই। হিসাব কইরা কইলাম এই ষোল কি সতের হইব আমার বয়স শুইন্যা সেই স্যারে চইলা গ্যালো।

খানিক বাদে বড় স্যারের ঘর থাইক্যা আমার ডাক আইল। চিন্তায় পইড়া গেলাম। আগেতো কোনদিন আমারে ডাকে নাই। ভয়ে ভয়ে স্যারের ঘরে গেলাম। স্যার আমারে জিগাইল জরিনা, তোমার বয়স কত? আমি কইলাম বয়সের কথা জিগান ক্যা স্যার, একটু আগে আরেক স্যারেও জিগাইল আমার কামে কি কোন ভুল হইছে

স্যার। হের বাদে স্যারে যে কথা কইল হেইডা শুইন্যা আমার পার নিচের মাটি সইরা গ্যালো।আমিতো পড়া-লেহা জানিনা, স্যার আমারে বুঝাইয়া কইল কি বলে কমপিলাইন্স হইছে।বিদেশ থাইকা আমাগো যারা কাম দেয় তারা নাকি এহন ম্যালা নিয়ম বাইন্দা দিছে। আমাগো মত যাগো বয়স এহনও আঠার বছর হয়নাই তাগো নাকি কামে রাহন যাইবনা রাখলে হেরা কাম দিবনা তাই আমারে আর কামে রাখবনা। আমার পাওনাপাতি লইয়া আমারে আমার বাড়িতে চইল্যা যাইতে কইল।

আমি চোঁখে আন্দার দ্যাখতে লাগলাম। বড় স্যারের হাতে পায়ে ধরলাম, কইলাম স্যার আমার আঠার বছর বয়স না হইছে তো কি হইছে, যাগো বয়স হইছে আমি কি তাগোর চাইতে কম কাম করি। কম প্রডাকশন দি, আমার কাম কি সুন্দর হয়না। আমারে কাম থাইক্যা বাদ দিয়েননা স্যার, কাম না থাকলে খামু কি, যামু কই। বড় স্যার আমার মাথায় হাত রাইখ্যা বুঝাইয়া কইল, তোমার কোন দোষ নাই জরিনা, তোমারে কামে রাখলে তোমার মত দশজনের লাইগ্যা একশ জনের কাম বন্ধ হইয়া যাইব তুমি কি এইডা চাও। এর চেয়ে বরং তুমি অন্য কোন কাজ খুইজ্যা নাও। আমারা দোয়া করি তোমার ভালা হইব। আমি বুইজ্যা চইলা আইলাম। মনে মনে কইলাম আমার আর কি ভালা হইব। আমার সব সুখ সব সপ্ন চোক্ষের নিমিশে কাচের গিলাসের নাহাল হাত থাইক্যা পইড়া ভাইঙ্গা চুরচুর হইয়া গ্যালো।

আপনারা যারা আমাগো ভালার লাইগ্যা এত নিয়ম বাইন্দা দিছেন, সেই আপনাগোর কাছে আমার একটা প্রশ্ন- আপনারা একবারও কি আমার মত জরিনাগো কথা ভাবলেন না। যে দ্যাশে জরিনারা ষোল বছরে বউ হয় মা হয় আবার বিধবাও হয় সেই দ্যাশে জরিনাগো কাম করনের লাইগ্যা আঠারো বছর বয়স লাগব এইডা আপনাগো কেমন বিচার? বাপে জন্ম দিছে খাইতে দিতে পারেনা, দ্যাশ আমগো কাম দিতে পারেনা।আমরা অহন কই যামু, কার কাছে যামু কইতে পারেন?

এই বয়সে বড়লোকের বাড়ীতে কাম জোটেনা, রাস্তায় খাড়াইলে কেউ ভিক্ষাও দেয়না, আবার মাইয়াডারে লইয়া কেউ বিয়াও করতে চায়না। অহন শরীর বেচন ছাড়া উপায় কি আছে? তাতেও বলে পাপ হইব কিন্তু প্যাডের ক্ষিদাতো পাপ পুণ্যের কথা মানেনা, হে তো তিন বেলাই তার ক্ষিদার কথা মনে করাইয়া দেয়। এই প্যাডের লাইগ্যাইতো সব কিছু। অহন না হয় শরীরে জোর আছে এইডারে বেইচ্যা খাইতে পারমু, কিন্তু কয়দিন বাদেতো শরীরের জোরও থাকব না তহন প্যাটেরে কি দিয়া বুঝ দিমু, আর মাইয়াডারেই বা ক্যামনে বাঁচামু কইতে পারেন?

আপনাগো কাছে অমার একটাই আর্জি, আপনারা আমার মত জরিনাগো কথা একবার ভাইবেন। আমাগো একটু কাম করোনের সুযোগ কইরা দিয়েন যাতে আমরা প্যাটে ভাতে বাঁচতে পারি।

এই সেই ব্যাবিলন

পুলিন
অপারেটর, কার্ড নং-৭৭২

এই ব্যাবিলন মাত্র তিন লাইন নিয়ে যাত্রা শুরু করে ঐ পূরবী সুপার মার্কেটের চার তলায় ভাড়া নিয়ে, অনেকের ধারনা ছিল ব্যাবিলন সবার সাথে প্রতিযোগীতায় বাজারে টিকে থাকতে পারবে কি? কিন্তু এই ব্যাবিলনের পরিচালকদের চিন্তাভাবনা ছিল এতই অনড়, এতই অটল যার কারনে তাদেরকে পিছে তাকাতে হয়নি। শুধুই তাদের গতি ছিল সামনের দিকে। কিছুদিন পরে পূরবী হলের উপরে সুরভী গার্মেন্টস শুরু করে ওখানেও তিন লাইন। তার কিছু দিন পরে সাত নং সেকশনে রিলায়েন্স টেক্সটাইল মিলের চার তলায় বেবিলন ড্রেসেস শুরু করে এখানে সাত লাইন। অবশ্য এ ড্রেসেস এর জন্মলগ্নেই আমি চাকুরী নিই হেলপার পদে মাত্র ৭০০ টাকা বেতনে। চলতে খুব কষ্ট হত, মেসে যে খরচ হতো তা আমি সব দিতে পারতাম না, মেসের লোকেরা বলত তুমি খাওয়ার টাকা দিতে পারনা তুমি আমাদের সাথে খেতে পারবেনা। আমি তখন একা পাক করে খাই, তরকারী পাক করতে পারতাম না, তিন বেলা ডিম ভাজি করে খেতাম।সেই দিন এখন আর আমার নেই। আমার বেতন এখন ২৭০০ টাকা, সব নিয়ে ৩৫০০/৩৮০০ টাকা পর্যন্ত পাই। আমার একটি ছোট বোন আছে, তাকে বিবাহ দিয়েছি। তার বিয়েতে ৩৫,০০০ টাকা খরচ করেছি, ব্যাংকে আছে ৩৫,০০০ টাকা। কালার টিভি আছে সিডি কিনেছি, সোফা কিনেছি, খাট কিনেছি, আরও সংসার করতে যা যা দরকার, ৪০ হাজার টাকা এখানে লেগেছে। বাবাকে দিয়েছি ১০,০০০ টাকা। এক বন্ধু ১০,০০০ টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। সবই এ ব্যাবিলনের টাকা। যাক পরের কথায় আসি, বেবিলন ড্রেসেস এর ম্যানেজার ছিলো বুলবুল স্যার এবং খায়রুল স্যার বুলবুল স্যার আর বর্তমান এ্যাসিটেন্ট ম্যানেজার মামুন স্যার আমাকে অপারেটর হতে সাহায্য করেছে। আসল ২০০০ সালের ঈদ, তখন এমদাদ স্যার মিটিং করে বলল, আমরা নিজস্ব বিল্ডিং-এ যাব, ঈদের পরেই আর এই দিন টাই ছিল আমার স্মরণীয় দিন। আমি একটু ছবি আঁকতে ভালবাসি। আমি একটা প্যাটার্ন বোর্ডে একটি দোয়েল আর একটি গোলাপ ফুলের ছবি আর্কি আর নিচে লিখি গুড বাই টেক্সটাইল ঐ বোর্ডটা দুইজন আয়রন ম্যান এমদাদ স্যারের কাছে নিয়ে যায় তাকে দেখানোর জন্য। স্যার বলল কে এই ছবি এঁকেছে? সবাই আমাকে দেখিয়ে দিলো, স্যার বলল ওকে ডেকে নিয়ে আসো। আমিতো ভয়ে শেষ, ভাবলাম এই বুঝি আমার চাকরি শেষ। গেলাম স্যারের কাছে, স্যার বলল কে এই ছবি এঁকেছে, বললাম আমি স্যার, স্যার আমার সাথে হাত মিলিয়ে বলল আমাদের নতুন বিল্ডিং-এ বড় বড় দেয়াল আছে সেখানে ছবি আঁকবেন। অনেক আনন্দ হয়েছিল। ঐ ঈদে নয়দিন ছুটি ছিল। সামনে ২০০০ সাল আবার নিজস্ব বিল্ডিং এ যাচ্ছি। সব মিলিয়ে খুশি আর খুশি। আসলাম বাড়ি থেকে, গেলাম নতুন বিল্ডিং-এ সেখানে গিয়ে দেখি এত সুন্দর মনোরম পরিবেশ যা কল্পনাও করা যায়না। কি এখানে নেই, খোলা মেলা পরিবেশ, দক্ষিণা বাতাস, সুন্দর পানির ব্যবস্থা, অসংখ্য টয়লেট, ট্রেনিং সেন্টার, মেডিকেল সেন্টার, বাচ্চা রাখার রুম, উপরে খাবারের পরিপাটি জায়গা, সুন্দর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। ইত্যাদি যা ব্যাবিলনে চাকুরী না করলে কেউ বুঝতে পারবেনা। ব্যাবিলন শুধু এখানেই থেমে থাকেনি, সাভারে করেছে-অবনি ফ্যাশন, করেছে টেক্সটাইল মিল, অবনী নীট ওয়্যার, পোল্ট্রি ফার্ম, মাছের চাষ, ব্যাবিলন ট্রিমস, ব্যাবিলন ওয়াশিং ইত্যাদি যাতে কাজ করছে হাজার হাজার মানুষ।

ব্যাবিলন হল এক উজ্জ্বলময় ভবিষ্যতের নাম। এখানে আপনি চাকুরী করলে আপনার যোগ্যতা অনুযায়ী মূল্যায়ন পাবেন। আসলে এই প্রতিষ্ঠান আপনার যোগ্যতানুযায়ী আপনাকে মূল্যায়ন করে থাকে, এই ভাবুননা, বর্তমান এ্যাসিটেন্ট ম্যানেজার সেলিম স্যারের কথা, সে ছিল একজন আয়রন ম্যান সে এখন ম্যানেজার, এ রকম অনেকেই আছে যারা এই ব্যাবিলনে মূল্যায়িত হয়েছেন। আসলে আমাদের সালাম স্যার এবং এমদাদ স্যার এত উদার মনের মানুষ যার তুলনা হয়না। আমার চাকুরীর বয়স প্রায় ১০ বছর। দেখেছি তারাও (সালাম স্যার এবং এমদাদ স্যার) আমাদের সাথে ডিউটি করে সারাদিন আমাদের সাথেই থাকে। আমাদের সাথে কথা বলে। কারো কোন অভিযোগ থাকলে শোনে, অন্য সব অফিসের মালিকেরা মাসে ২/১ বার ফ্লোরে যায় আবার কারো সাথে কথা বলেনা।

সব মিলিয়ে আমি বলতে পারি সালাম স্যার এবং এমদাদ স্যার যদি বাংলাদেশটাকেও পরিচালনা করতেন তাহলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি থাকতো এই ব্যাবিলনের মতো। আমি দোয়া করি ব্যাবিলন গ্রুপ যেন আরো এগিয়ে যায় এবং তাতে হাজার হাজার কর্মী তাদের দ্বারা উপকৃত হয়। তাদের সুনাম যেন দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তারা যেন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিত্ব অর্জন করে এবং তাদের দীর্ঘ আয়ু কামনা করে সকলের সুস্থতা কামনা করে আমার লেখা শেষ করলাম।

চীন সফরের কথকতা

(২৩-৩০ এপ্রিল, ২০০৬)

মুহাম্মদ সাইফুল হক
ডেপুটি ম্যানেজার, মার্চেন্ডাইজিং

৫ই এপ্রিলের সুন্দর এক সকালে লি্ এন্ড ফুং কোম্পানীর ম্যানেজার মিস রিতা হুই একটি পত্র পাঠান মাননীয় পরিচালক এমদাদ স্যারের কাছে। পত্রে চায়নায় অনুষ্ঠিতব্য মাদার্স ওয়ার্ক পরিচালিত একটি সেমিনারে প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য তিনি অনুরোধ জানান ।

পত্রটি দেখার পর থেকে ক্রেতা মাদার্স ওয়ার্কের মার্চেন্ডাইজার হিসেবে চঞ্চল চিত্তে অপেক্ষা করতে থাকি স্যারের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য । আলোচনার চার দিন পর সেমিনারে আমার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হওয়ায় পাসপোর্ট, ভিসা ও টিকিট সংগ্রহের প্রক্রিয়ার সাথে সাথে চায়না সফরের রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে ভাসতে থাকি সারাক্ষণ। কল্পনা বাস্তবতায় রূপ নিল ১৮ই এপ্রিলের বিকেলে যখন হাতে পেলাম ভিসা এবং টিকিট । টিকিট পাওয়ার পর শুরু হল প্রস্তুতি।

যাত্রা শুরু হল ২৩শে এপ্রিল রাত ১০টায়। বিমানবন্দরে গিয়ে দেখি আমার আগেই পৌঁছে গেছেন আমার সহযাত্রীরা। একই সাথে বোর্ডিং পাস এবং ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করে আমরা যখন ড্রাগন এয়ারলাইনসের বিমানে উঠলাম তখন মধ্যরাত অতিক্রান্ত। বিমানের আলো আঁধারীতে ঘুম আসছিলো না, চোখে ভেসে উঠল বিদায় বেলায় বউয়ের মলিন মুখখানি। মনে পড়তে থাকল সাংসারিক জীবনের নানা স্মৃতি। স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। তন্দ্রা কাটল হংকংয়ের উদীয়মান সূর্যের আলো যখন আমার চোখে ঠিকরে পড়ল এবং এরই মধ্যে কেটে গেল চারটি ঘন্টা। বিমান থেকে অবতরণের পর ইমিগ্রেশনের বৈতরণী পেরিয়ে আমার ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি বাজে ভোর পাঁচটা। মিস রিতা হুই আমাদের নিয়ে গেলেন বিমান বন্দরের একটি ব্যস্ততম রেস্তোঁরায় যেখানে আসনের প্রতীক্ষায় দাড়িয়ে রইলাম অন্তত ঘন্টা খানেক। অবশেষে যা খেলাম তা না খেলেও কোন ক্ষতি ছিল না । যারা ভাবছেন হংকংয়ের লোক কি খুব ভোরে নাস্তা করে তাদের জন্য বলছি- না, আসলে ভৌগলিক কারণে হংকং আমাদের দেশের পূর্বে হওয়ায় আমার ঘড়িতে পাঁচটা হলেও হংকং সময় ছিল সকাল সাতটা। অবশেষে নামকা ওয়াস্তে নাস্তা খেয়ে চেপে বসলাম ট্যাক্সিতে, গন্তব্য লি্ এন্ড ফুং হংকং অফিস। যেতে যেতে হংকং শহরের নির্মাণশৈলী এবং প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে আমরা ছিলাম মুখর ও চঞ্চল। লি্ এন্ড ফুং প্রতিনিধি আসলাম সাহেবের নানা মন্তব্য আমাদের আনন্দকে বাড়িয়েছিল বহুগুন। লি্ এন্ড ফুং অফিসে ঢোকামাত্র আমাদের সমস্ত আনন্দ যেন ফুৎকারে নিভিয়ে দিলেন কেউ। জানতে পেলাম আসলাম সাহেবের মা ইন্তেকাল করেছেন যখন তিনি বিমানে উড্ডীয়মান ছিলেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল, সকালের মিটিং পিছিয়ে বিকেলে নির্ধারিত হল। আসলাম সাহেবকে নিয়ে আমরা বাইরে বেরিয়ে পড়লাম, আমাদের সঙ্গী হলেন বন্ধুবর মিঃ এলান। তিনি আমাদের প্রথমে নিয়ে গেলেন একটি ভারতীয় রেস্তোঁরায়। আমরা সকলেই সেখানে প্রানভরে সুস্বাদু খাবার খেলাম। খাবারের পর গেলাম হংকং হারবারে, পেট ভরানোর পর মিঃ এলান আমাদের মনটাও ভরিয়ে দিলেন সমুদ্রের নির্মল খোলা হাওয়ায়। বেশ খানিকটা সময় কাটলো সমুদ্র উপকূলের সৌন্দর্য দর্শনে আর ব্যস্ত মানুষের সুশৃঙ্খল চলাচল দেখে। এরই মধ্যে আসলাম সাহেব তার মা হারানোর শোককে খানিকটা আড়াল করতে

পেরেছিলেন। বিকেলে মিটিং থাকায় সুদৃশ্য শপিংমলগুলো দূর থেকে কেবল দেখতে দেখতে ফিরতে হল লি্ এন্ড ফুং অফিসে। ত্রিপক্ষীয় এই মিটিং শেষে এবার যাত্রা করলাম কাঙ্খিত সেই চায়নার উদ্দেশ্যে। আমাদের সঙ্গী হলেন লি্ এন্ড ফুং-এর দুই প্রতিনিধি। চায়নার উদ্দেশ্যে গাড়ীতে ওঠার পর খুব ইচছা ছিল চারপাশের দৃশ্য উপভোগের কিন্তু আমার সে ইচ্ছাকে মূল্য দেয়নি আমার-ই ক্লান্ত ঘুমকাতর চোখ।

চায়না সীমান্তে আসার পর লি্ এন্ড ফুং-এর প্রতিনিধিরা আমাদের ইমিগ্রেশন দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য যে প্রাণপন চেষ্টা করছিলেন তা সত্যিই ভোলবার নয়। প্রকারন্তরে চায়নীজ ইমিগ্রেশন অফিসারেরা পাসপোর্ট নাম মুহাম্মদ দিয়ে শুরু হওয়া ভ্রমণকারীদের সাথে আমাকেও কোন কারন না বলে দুই ঘন্টা বসিয়ে রেখে যে অস্বস্তির সৃষ্টি করেছিলেন তাও কোনভাবে ভোলবার নয় । অবশেষে সেনজেনের হোটেলে গিয়ে পৌছলাম চায়না সময় রাত নটায়। কিন্তু হোটেলে পৌছেও যখন রুমে পৌছতে লাগল প্রায় একটি ঘন্টা তখন একটু বিরক্তই হলাম ইংরেজীতে অদক্ষ লোককে দিয়ে বিদেশীদের অভ্যর্থনার এই প্রচেষ্টার জন্য। লি্ এনড ফুং-এর প্রতিনিধিদের অপরিসীম ধৈর্য্য ও আন্তরিক আতিথীয়তায় শ্রদ্ধাবনত হতে হল যখন জানলাম তারা আমাদের জন্য অপেক্ষারত থাকবেন সকলে মিলে ডিনারে যাওয়ার জন্য। ডিনারটি আমাদের কারও কারও ক্ষুধা নিবারণে ভূমিকা না রাখলেও তাদের সাথে নানা বিষয়ে হাস্যরস ছিল সত্যিই উপভোগ্য। ডিনার শেষে যখন হোটেলে ফিরছি তখন সকলের অগোচরে একবার হোটেল অভ্যর্থনা থেকে দেওয়া নাস্তার কুপনটি দেখে যত্ন করে রেখে দেই। রাতে ঘুমটা একটু বেশীই হয়েছিল, পরদিন যখন হোটেলের ফ্রি নাসতার জন্য নির্ধারিত সময়ের শেষভাগে গিয়ে জানতে পারি সময় অতিক্রান্ত তখন আমাদের দুঃখী ও অসহায় চেহারাটা কারও দৃষ্টি এড়ায়নি। অবশেষে খালি পেটেই সেমিনারে অংশগ্রহণ। কাজের খানিকটা নেশা ও জানার কতকটা আগ্রহ থাকায় সেমিনারের পুরোটা সময় কাটে নিমগ্নতায়। সেমিনার শেষে আমন্ত্রণ পাই শপিং-এ যাওয়ার এবং রাজী হয়ে যাই সকলে । কেনাকাটা সেরে আবারও সম্মিলিত ডিনার। ডিনার শেষে একটিই চিন্তা পরদিন সকালে উঠতে পারব তো। পরদিন হোটেল লবিতে নেমে দেখি সকলেই আমার অপেক্ষায়, একটু লজ্জা পেলাম, সেদিন আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন মিঃ কেনি, লি্ এন্ড ফুং, বাংলাদেশের কিউসি ম্যানেজার। সকলে মিলে নাস্তা খেতে গিয়ে দেখি একটি উপাদানও আমাদের খাওয়ার উপযোগী নয়। সকলের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে মিঃ কেনি তৎক্ষণাত চলে গেলেন সুপার মলে। দ্রুত কিনে আনলেন বিভিন্ন ফল, কেক এবং গরুর দুধ। গাড়ীতে খেতে খেতে চললাম সেমিনারে। কারিগরী এই সেমিনারের অভিজ্ঞতা আমাকে একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল বলেই আমার মনে হল। সেমিনার শেষে বেড়ালাম শহর দর্শনে, এত সুন্দর এই শহরের সাথে নিজের শহরের তুলনা করতে গিয়ে মনটা বিষাদে ভরে গেল। জানলাম মাত্র বিশ-ত্রিশ বছরেই তারা প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে।

সফরের চতুর্থ দিনটি ছিল সর্বসেরা। কাইনুন নামক কোম্পানীর সৌজন্যে হয়ে উঠেছিলাম ভি.আই.পি। সকালেই কাইনুন পাঠিয়েছিল একটি সুদৃশ্য গাড়ী, সাথে একজন আমাদের দেশীয় কর্মকর্তা। বুঝতে পারছিলাম দিনটি ভালই যাবে। অফিসে ঢোকার সাথে সাথেই শুরু হল পরিচিতি পর্ব, পর্বটি শেষ হওয়ার আগেই আমার ভিজিটিং কার্ড শেষ হয়ে যাওয়ায় কার্ডের ফটোকপি দিতে হল অনেককে। অতঃপর শুরু হল একের পর এক মিটিং বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে। মিটিং শেষে তাদের সকল উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ও মালিকের সাথে মধ্যাহ্ন ভোজের যে আয়োজন দেখলাম তা ছিল আমার

ধারণারও অতীত। সবশেষে আমাদের কোম্পানী সম্পর্কে ভালো ধারণা হওয়ার কথা জানালেন কাইনুনের মহাব্যবস্থাপক। একটি ক্রেষ্ট আমার হাতে তুলে দিয়ে ভবিষ্যতে ব্যবসা শুরু করার আশাবাদও ব্যক্ত করলেন তিনি। মিটিং শেষে কেনাকাটা ও একটু ঘোরাঘুরির পর ছিল ডিনার, সঙ্গী হলেন কাইনুনের চার প্রতিনিধি। তারপর আমাদের জন্য যা অপেক্ষা করছিল তা ছিল স্বপ্নের মত। একটি সুদৃশ্য পাজেরো জীপ যা দিয়ে পারাপার হব এক দেশ থেকে আরেক দেশে। সত্যি অসাধারণ সুন্দর ছিল রাত্রিকালীন সেই ভ্রমণ। চায়না ঢোকার সময় তাদের ইমিগ্রেশন দুই ঘন্টা বসিয়ে রেখে হৃদয়ে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল তা যেন মুছে দিল কাইনুন, গাড়ীতে বসিয়েই ইমিগ্রেশনের সমস্ত ঝামেলা চোখের পলকে সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে।

ফিরে এলাম চেনা শহর হংকং-এ। শেনঝেন থেকে ফেরার পূর্বে আরও একটি মিটিং নির্ধারিত হওয়ায় হংকং-এ থাকতে হল আরো দুদিন অত্যন্ত চড়া হোটেল ভাড়ায়। তবে পঞ্চম দিন কোন কাজ না থাকায় ঘুরেই বেড়ালাম বাণিজ্যিক নগরী হংকং, দুপুরের খাবার খেলাম সুপ্রিয় চুংকিং ম্যানসনে । বিকেলে হোটেলে এলেন পূর্ব পরিচিত স্বপন ভাই ও ভাবী। কেনাকাটা এবং রাতের খাবার খেলাম একত্রে। পরিচয় হল এক সুখী সিঙ্গাপুরী মুসলিম দম্পতির সাথে, যারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন সারা বিশ্ব তাদের বৃদ্ধ জীবনে। ষষ্ঠ দিন সকালেই আমি আলাদা হয়ে গেলাম পেরি এলিসে মিটিং-এর জন্য। মনে ছিল বাড়ী ফেরার আনন্দ ও প্রস্তুতি। চুং কিং ম্যানসনে নাস্তা সেরে রওনা হলাম পাতাল ট্রেনে। গন্তব্য কুন টং, পেরি এলিস, হংকং অফিস। মিটিং শেষে আবারও চুংকিং ম্যানসনে খাওয়া দাওয়া সেরে ফেরার পথে যা দেখলাম তা আমাকে কেবল মুগ্ধই করেনি বরং হংকং জাতির প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করে দিল। চুংকিং ম্যানসনের মসজিদের এক পাশে ফাঁকা জায়গায় চমৎকার ইউনিফর্ম পরে কিছু লোক ব্যান্ড বাজাচ্ছিল। একটু কাছে যেতেই দেখি একপাশে লম্বা ব্যানার টাঙানো যাতে লেখা আছে, তারা প্রধান বিচারপতির অসদাচারণের জন্য শাস্তি চায়। বিনোদনপূর্ন এই সুদৃশ্য বিক্ষোভ দেখে আমার সন্দেহ হল এতে আদৌ দাবী আদায় হবে কিনা কিন্তু সেখানে বসবাসকারী বাঙ্গালী ভাইদের সাথে আলোচনা করে জানতে পারি এটিই তাদের দাবী আদায়ের প্রচলিত এবং সফল পন্থা। সরকার যেমন পরিস্থিতি এর চেয়ে কঠিন বা খারাপ হওয়ার কোন সুযোগ দেবে না আবার বিক্ষোভকারীরাও জনগণের অসুবিধা হয় এমন কোন কর্মসূচী নেবে না। আমি তখন ভাবছিলাম, আমাদের জাতীয় রাজনীতিবিদদের কথা। তাঁরা যদি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের এই দৃষ্টান্তটুকু অনুসরন করতে পারতেন তাহলে আমাদের সাধারণ নাগরিকদের জীবন কতইনা শংকামুক্ত হত। হোটেল ছেড়ে বিমান বন্দরে এসে দেখি নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই বিমান গেটে বাঙ্গালীদের ভীড়। বুঝলাম সকলেই বাড়ী ফেরার তাড়া ও তাড়নায় ভুগছে। বিমান ছাড়ল হংকং সময় রাত সাড়ে দশটায় অর্থাৎ বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে আটটায়। বিমানে অবস্থানের সাড়ে তিনটা ঘন্টা কেটে গেল হংকং-চায়না সফরের নানা স্মৃতি রোমন্থনে। গভীর রাতে বাড়ী ফিরে প্রিয় স্ত্রী-কণ্যার মুখখানি দেখে দূর হল ভ্রমণ ক্লান্তি আর বউয়ের হাতের গরম খিচুড়ী মিটিয়ে দিল ক্ষুধা। রাতের পরম সুখের ঘুম ভ্রমণের সমস্ত স্মৃতিকে যেন চিরতরে অম্লান করে রাখল আমার মস্তিষ্কের মণিকোঠায়।

১৪১৩ সাল

মো: আবদুল হাই ফরাজী
সুপারভাইজার (কিউ, সি), পিন নং ১৩৫, অবনী টেক্সটাইল লি:

আজ থেকে শুরু হলো ১৪১৩ সাল
সবার মনে ধরবে না আর আনন্দ কোলাহল।
নববর্ষের প্রথম দিনে কত মানুষের ভীড়
তাইতো সবাই জেনে গেছে আসছে বৈশাখী।

মানুষের মনে জমছে কত আনন্দ উৎসব
কিনছে তারা সবাই মিলে পছন্দ জিনিস সব।
বাজছে কত ঢোল বাজনা গাইছে কত গান
দেখতেছে মানুষ সবাই শুনছে মন প্রাণ।

নেই ভেদাভেদ গরীব ধনীর আনন্দ সবার
মনের খুশিতে গাইছে তারা নববর্ষের গান।
খাইছে তারা সবাই মিলে পানতা আর মাছ
কিনছে তারা নানান জিনিস পরবে বার মাস।

শুধু তোমাকে

মোহাম্মদ দ্বীন ইসলাম (রুবেল)
পিন নং ১৩৬, কিউ, সি, সেকশন, অবনী টেক্সটাইলস্ মিল লিঃ

আমি ভাবতে পারি না, যা কিছু কোমল
আমি দেখতে চাই না, যা কিছু সুন্দর,
কারন সব কিছুর মাঝে লুকিয়ে আছে
বিভ্রান্তি, প্রবঞ্চণা, আর প্রতারণা।
এভাবে আর কতদিন তাকিয়ে রবে উদাসীন হয়ে
এভাবে আর কতদিন ভাল বাসা বুকে,
নিয়ে থাকবে তোমার মনের গভীরে।
তোমার কথা যখন মনে পড়ে
আমার সমস্ত অস্তিত্বের সামনে,
ভেসে আসে শুধু তোমারই ছবি।
তোমাকে জড়িয়ে ধরে একবার
শুধু একবার বল ভালবাসি।
শুধু তোমাকে।।

একা পড়ে আছি

আমিনুর রহমান (সেলিম)
সহঃ অপারেটর, নিটিং বিভাগ, পিন নং-৪০৪, অবনি টেক্সটাইল লিঃ

হৃদয়ের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ায় কত অচেনা মুখ
মাঝে মাঝে খুঁজে পাই সেই চেনা মুখ
হঠাৎ কখনো খুঁজে পাই নিঝুম অন্ধকারে,
আবার কখনো মাঝে মাঝে দেখি দীর্ঘক্ষণ
হাজারো লোকের ভীড়
তবুও আসেনা এই জীবনে সেই চেনা মুখটি ঘিরে।
সময়ের স্রোতে অপেক্ষায় থাকি
তবুও আশায় সেই মুখের দিকে একাকিত্ব ভেঙ্গে নিয়ে
সেই প্রিয় মুখ যেন দাঁড়ায় সামনে এসে
মাঝে মাঝে মনে হয় পেয়ে গেছি তাকে।
হঠাৎ দেখি বালুচরে আমি নিঃস্ব হয়ে
শুধু একা পড়ে আছি।

সময়

মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম
হিসাব কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়, বসাবিলন গ্রুপ

ঘড়ির কাটার শব্দ যখন
করে টিক্, টিক্,
বুঝতে হবে সময় সবই
যায় চলে ঠিক ঠিক।

এত বুঝি তবু কেন
করি সময় নষ্ট,
জানি মোরা এ জন্য
পেতে হবে কষ্ট।

সময়ের কাজ সময় মত
করতে হবে অবিরত,
যদি করি অবহেলা
আসবে নেমে দুঃখের মেলা,
চাইনা মোরা কাল রাত
আনতে হবে রাঙা প্রভাত।

বাংলাদেশ

মোহাম্মদ দিদারুল ইসলাম
সুপারভাইজার (কিউ, সি), পিন নং: ১২৫, অবনী টেক্সটাইল লি:।

পৃথিবীর মানচিত্রে ছোট্ট একটি দেশ,
নাম তার বাংলাদেশ।
গুণের কথা বলতে গেলে হবে না তো শেষ,
অবারিত মাঠ, খোলা আকাশ, মুক্ত বাতাস,
করে তুলে আমাদের সুস্থ বিকাশ।
মাঠে-ঘাটে পথে-প্রান্তরে খোলা আকাশের নিচে,
বন-লতা, গাছ-পালায় যেন মিশে আছে।
তারি মাঝে বেঁচে থাকে, পশু-পাখি, মানব-মানবী,
এই ভাবে গড়ে ওঠে বাংলার বিশাল জনবসতি।

পাখির কলরবে এদেশের মানুষের ঘুম ভাংগে,
পূর্ব আকাশে সোনালী রৌদ্র নিয়ে সূর্য ওঠে।
কি এক অপূর্ব-রূপে এদেশ যেন সাজে,
ভৌগলিক চক্রে এদেশে ছয়টি ঋতু বিরাজ করে।
এক এক ঋতুতে নব-নির্মিতে তার অভিষেক ঘটে,
তারি সাথে বাংলার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।

আকাশ বাতাস গাছ-পালা যেন বর্ণালী রূপে সাজে।
রূপায়িত হয় অপরূপা দৃশ্যে,
আকাশ পানে চাহিলে, পরন্ত বিকালে,
ভেসে ওঠে হাজারো রঙের মেলা।
মন হয় রঙিন, বুকে বাঁধে কল্পহীন আশা।
মোদের দেশে এমন প্রকৃতির বেশে,
পৃথিবীর বুকে আরো দেশ কি আছে !
নাইকো তাহার জানা।
এদেশের নদীনালা, খালবিল, ঝিলে
ভরে থাকে জলে আর ফুলে।
আবহমান নদে মাছ ধরে জেলে,
মাঝিরা গায় গান, তুলে বাদাম।
রাখাল বাজায় বাঁশি চড়ায় গরুর পাল,
তুলে সুর বাজে সু মধুর।

পল্লীগীতি, ভাটিয়ালী, আর মুর্শিদীর গান।
কৃষাণ কিষাণীর গোয়ালে তুলে ধান,
আনন্দের চিত্তে নাচে তাদের প্রাণ।
একতারাটা হাতে নিয়ে,
বাউল গায়, বাংলা মায়ের গান।

এরকম এক অপরূপা রূপের দেশে,
সংস্কৃতি আর প্রকৃতিতে আছি মিশে ।
এ যে আমারি দেশ, মোদের বাংলাদেশ।

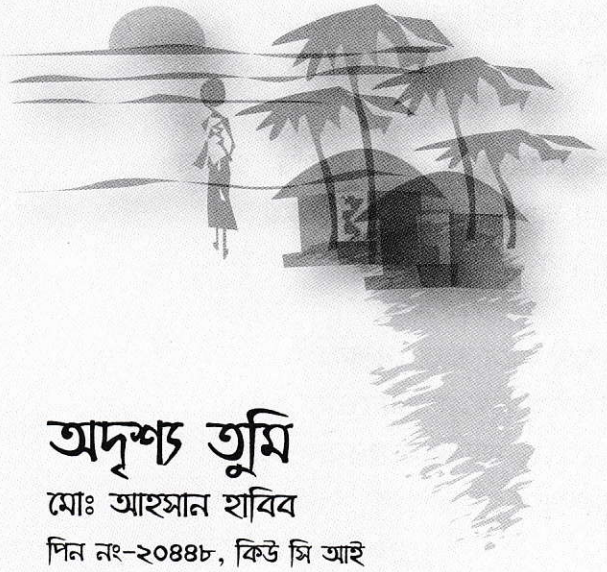

অদৃশ্য তুমি

মোঃ আহসান হাবিব
পিন নং-২০৪৪৮, কিউ সি আই

ও আমার সর্বাঙ্গ শরীরের স্রষ্টা
কখনো আমায় প্রাণ খুলে হাসতে শেখাও
কখনো নীরবে গাল বেয়ে অশ্রু ঝরাও
কখনো দুঃখী মানুষকে ভালবাসতে শেখাও
কখনো কঠিন পরীক্ষায় আমাকে ভাবাও।

এ তোমার আজব এক খেলা
ভেবে ভেবে বিকেল গড়িয়ে আবার আসে সন্ধ্যাবেলা।

ও আমার সুন্দর পৃথিবীর স্রষ্টা
কখনো চাঁদকে নীরবে রাত্রি জাগাও
কখনো সূর্যাস্তের সুন্দর দৃশ্য দেখাও
কখনো বৃষ্টি শেষে রংধনু গগণে সাজাও
কখনো হাসনা হেনার গন্ধ বাতাসে মেশাও।

এ তোমার আজব এক খেলা
ভেবে ভেবে বিকেল গড়িয়ে আমার আসে সন্ধ্যাবেলা।

চেয়েছিনু যারে

জান্নাতুল ফেরদৌস ইরা
অবনী টেক্সটাইল

চেয়েছিনু তারে গোধূলী বেলাতে,
আধ আধ সাঁঝে,
জোনাকির মিটি মিটি আলোর,
ঝিঁ ঝিঁ শব্দে।

সেতো আসেনি, বলেনি ভালবাসি তোমাকে।
আমার চাওয়াগুলো মিলায়ে দিয়েছে
মেঘে ঢাকা জোস্না রাতে।

চেয়েছিনু তারে বসন্ত বেলার,
কোকিলের কুহুকুহু তানে।
হাসনাহেনা, মাধবীলতা আর,
রজনীগন্ধার সুবাসে।

সেতো বোঝেনি, অনুভব করতে চায়নি,
আমার চাওয়াগুলোকে
লুটায়ে দিয়েছে দখিণা হাওয়াতে।

চেয়েছিনু তারে শরতের রাতে,
ভরা পূর্ণিমার আলোতে।
চেয়েছিনু তারে হৃদয়ো পটে মনের মাধুরীতে।

সেতো এলোনা কোন চাওয়ার মাঝে,
সেতো বাঁধলনা বাসা
আমার হৃদয়ের মোহনাতে।

আমার চাওয়াগুলো রয়ে গেল তারি জন্য
চেয়েছিনু যারে।

মোদের প্রিয় বাংলাদেশ

শফিকুল ইসলাম
সেকশন-কিউ এ, পিন নং-১০৩৩২

আসুন আমরা মুক্ত মনে
আসল কাজটি করি।
হিংসা বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে,
সোনার বাংলা গড়ি।

বাংলাদেশের মানুষ আমরা,
বাংলাদেশেই রবো।
সোনার বাংলা গড়তে আমরা,
সোনার মানুষ হবো।

শ্রমিক, মজুর, চাকুরীজীবি,
সকলে ভাই ভাই।
যে যেখানে আছি আমরা,
কাজ করাটা চাই।

দশের লাঠি একের বোঝা,
জানি আমরা সবে।
সবাই মিলে কাজ করিলে,
দেশের মঙ্গল হবে।

লাখো শহিদ রক্ত দিয়ে,
স্বাধীন করলো দেশ।
এখন আমরা গড়বো শুধু,
সুন্দর পরিবেশ ।

তোমারই স্মরনে আশা

মার্শাল সিরাজ (কিউ সি)
বি,জি,এল পিন নং ১০৬৩৯, লাইন নং ০৩

তোমারই স্মরণে রাত্রী প্রহরে
কবিতা লিখতে বসি।
কখন যে রাত ভোর হয়ে গেল
পার হল কালনিশি।

শিশির সিক্ত সোনালী অন্বেষা
এইতো ছিল মোদের আশা,
বিরহ্ ব্যথা বাদ দিয়ে
বাধবো মোরা সুখের বাসা।

পূর্ণ হলনা সে আমার মনের
অব্যক্ত কথাগুলি,
হারিয়ে গেল সব আমার
হৃদয়টা হল খালী।

ভেবেছিলাম তুমি অনেক
বড় মনের অধিকারী,
সবশেষে বুঝলাম তোমার
হৃদয়টা আসলে মরুভূমি।

গুরুশিষ্য

মোঃ ইউনুছ আলম (স্বপন)
নিটিং বিভাগ, অপারেটর, পিন নং ১৯৬

সবাই গুরু এই ভূবনে
কোথাও কোন শিষ্য নাই
উস্তাদিটা করছে সবাই
কেউ যেনো আর নিঃস্ব নাই।

ভাবছে বসে ভাব খান এই
মুই কি হনু মন্তরে
গর্ব-অহং রাখছে পুষে
মনের গহীন অন্তরে।

মিলছে গুরু পথে ঘাটে
মিলছে না তো শিষ্য
গুরুর ভাবে ভারাক্রান্ত
তাইতো মহাবিশ্ব।

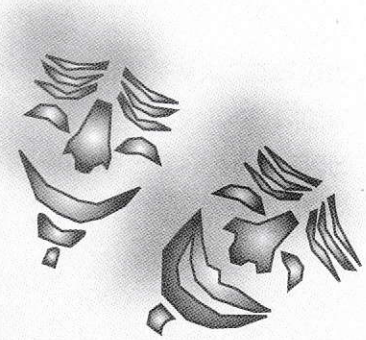

-ঃ কৌতুক ঃ-

'ফি' হচ্ছে কুড়ি টাকা

মোঃ ইউনুস আলম স্বপন
নিটিং বিভাগ, অপারেটর, পিন নং-১৯৬

মক্কেল ঃ কোন লোকের কুকুর যদি অন্য এক জনের মুরগী খেয়ে ফেলে, তা হলে আইন কি ব্যবস্থা নেবে?

উকিল ঃ যার কুকুর সে মুরগীর দাম হিসেবে দশ টাকা দেবে।

মক্কেল ঃ উকিল সাহেব, তাহলে এবার আমাকে দশ টাকা দিন। যে কুকুরটা আমার মুরগী খেয়েছে, সেটা আপনারই কুকুর।

উকিল ঃ তাই নাকি? তাহলে এবার আমাকে দশ টাকা দাও, জানই তো আমার পরামর্শ দেবার 'ফি' হচ্ছে কুড়ি টাকা।

ব্যাবিলন

আর. এইচ. নাহিদ
বয়স-১২ বছর
পিতাঃ মোঃ সোলায়মান আলী
ডেপুটি ম্যানেজার মেইন্টেন্যান্স

ব্যাবিলন, ব্যাবিলন,
প্রিয় ব্যাবিলন,
এইখানে কাজ করে
গরীব মানুষজন।

ব্যাবিলনে বসত সেতো
নয় ইরাকে,
এই ব্যাবিলনের বসত
এশিয়া হলের পাশে।

এইখানে তৈরী হয়
কত রকম জামা
জামাগুলো জামা নয় যেনো
রেশমী সুতোয় বোনা।

এই জামা বিভিন্ন দেশে
রপ্তানি করা হয়,
প্রচুর ডলার বিদেশ থেকে
আয় করা হয়।

যত কিছুই বলনা কেন
এই ব্যাবিলন নিয়ে
শহরেতে এই রকম গার্মেন্টস
কোথাও পাবে না খুঁজে।

আহবান

মোঃ আবুবাক্কার ছিদ্দিক
জুনিঃ ইন্সপেকটার কিউ, সি সেকশন
অবনি টেক্সটাইল লিঃ

ঐ চেয়ে দেখ নদীতে
তরীগুলো কেমন বয়ে চলছে।
তুমি কেন এখনও অচেতন,
কেন আছ, ঘুমিয়ে?

কান পেতে ঐ শোন
আজানের সুরে ভেসে আসছে
চারপাশ আলোকিত, পাখিরা ডাকছে
তবে কেন তুমি এখনও ঘুমিয়ে?

তুমি যুবক, তুমি দুরন্ত
নও তুমি বৃদ্ধ
তোমার মেরুদন্ড এখনও যায়নি বেঁকে
তবে কেন তুমি এখনও অচেতন
জেগে ওঠ যুবক, নিশ্চুপ থেকনা আর
ঝেড়ে ফেল সব অলসতার
খুলে দাও সব বন্ধ দুয়ার।

চেয়ে দেখ দুর্বাঘাসের ডগায়
শিশিরে আলোক সজ্জা
ডাকছে দিবাকর, বাসর পাতিয়া
মিনতি করি যুবক,
ঘুমিয়ো না আর বেলা যে যায় গড়িয়ে।

‘বন্ধু’

মোঃ শামীম আহমেদ, অপারেটর নিটিং বিভাগ, পিন-১৬৮

শরতের শিউলী ঝরা সুবর্ণ সকাল, বসন্তের কোকিলের সুরারিত মিষ্টি কন্ঠ আমাকে এখন আর হাতছানি দিয়ে ডাকেনা। এই এত বড় পৃথিবীতে কত রকমারি সুখের ছড়াছড়ি অথচ আমি সব কিছুর মোহ ছেড়ে ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছি এক অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের দিকে। বড় অদ্ভুত এই পৃথিবী। আমার চারপাশে প্রতিনিয়ত কত বিচিত্র সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে অথচ আমাকে কোন কিছুই আর স্পর্শ করেনা, আমার জীবনের সব আনন্দ-সুখ ভোরের কুয়াশারমত উঁকি দিয়ে চিরতরে বিদায় নিয়েছে। তোমাকে নিয়ে আমার সুখের দিনগুলো ছিল আলোয় পরিপূর্ণ। তুমি চলে গেলে সব আলো নিয়ে রেখে গেলে সব অন্ধকার। আমার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে শুধু তুমি। তোমার কল্পনাই আমাকে ভাবায় সারাক্ষণ।

তুমি আমার, একান্তই আমার ছিলে। তোমাকে নিয়ে আমার নিজের একটা জগৎ ছিল, বিশাল একটা আকাশ ছিল। যে আকাশে একটি মাত্র তারা ছিল। এখন সবই আছে, জগৎ আছে, আকাশ আছে, আমি আছি শুধু তুমি নেই, হারিয়ে গেছো কোন অতল গহ্বরে।

তোমার উপর আমার অসীম বিশ্বাস ছিল। আমার এক জীবনের সমস্ত ভালবাসা, শিকড় মাটিসুদ্ধ তোমাকে দিয়েছিলাম। তোমার হাসি আমাকে পথ চলার শক্তি জুগিয়েছিল। অথচ তুমি আমার সমস্ত কিছু মিথ্যে করে চলে গেলে। ভালবাসার বদলে ঘৃণা পেলাম।

তুমিই আমার সত্যিকারের বন্ধু ছিলে, যতদুরে, যেখানে, যেভাবে থাক, ভালথেকো। জীবনের অসহনীয় দুঃখ কষ্টগুলো যেন তোমাকে কখনই স্পর্শ করতে না পারে। আমার জগতে বাকীটা জীবন তুমি, শুধুই তুমি থাকবে। যদি কখনও তোমার সুখের ভূবনে আঁধারেরা ঘরবাঁধে আমায় নিমন্ত্রণ করো, আমি তোমার ভূবনের আলোকবর্তিকা হব।

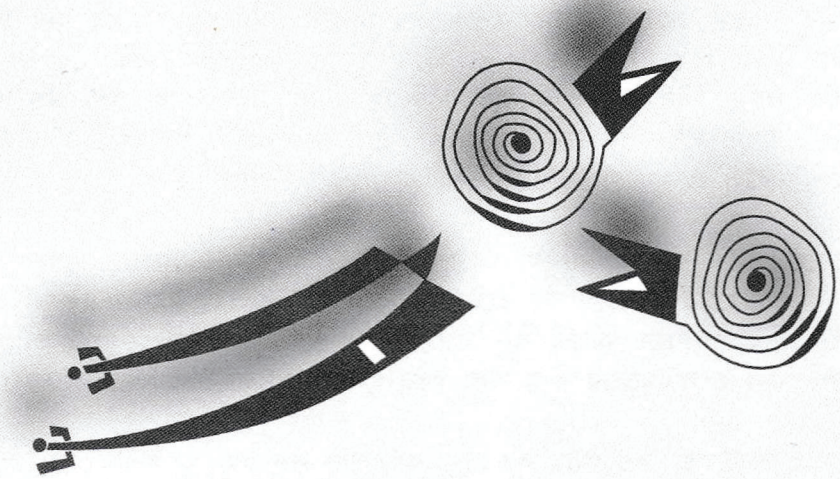

পোশাক শিল্প ও বাংলাদেশ

মোঃ রুকনুজ্জামান চৌধুরী, জুনিঃ অফিসার (আর এন্ড ডি)

ভূমিকাঃ মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম হল পোশাক। আজকের সভ্য সমাজে পোশাক ব্যতীত মানুষের জীবন কল্পনারও বাইরে। আদিম যুগ হতে বিভিন্ন বস্তু দিয়ে মানুষ তার শরীরকে আবৃত করে আসছে। অন্ধকার যুগেও মানুষ পশুর চামড়া গাছের ছাল বা পাতা ইত্যাদি দিয়ে লজ্জা নিবারণ করতো। পরবর্তী সময়ে মানুষ চামড়াকে প্রক্রিয়াজাত করে পোশাক হিসেবে ব্যবহার করতো।

খৃষ্টপূর্ব প্রায় ২০০০ সালের দিকে মানুষ কাপড় আবিষ্কার করে এবং তাঁতের সাহায্যে তখন কাপড় তৈরি করতো। তখন সেলাই মেশিন ছিলনা বলে মানুষ কাপড়ে ছিদ্র করে ফিতার সাহায্যে তা শরীরে বেধে রাখতো। কাপড় আবিষ্কারেরও অনেক পরে সেলাই মেশিন আবিষ্কৃত হয়।

সেলাই মেশিন আবিষ্কার : MR. WASANTHAL নামক লন্ডনে বসবাসকারী এক জার্মান ভদ্রলোক ১৭৫৫ সালে সর্ব প্রথম SEWING NEEDLE আবিষ্কার করেন। তারও ৩৪ বৎসর পর ১৭৮৮ সালে Thomas Saint নামক এক ইংরেজ ভদ্রলোক SEWING MACHINE আবিষ্কার করেন। তবে এদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ISSAC MEMMIT SINGER এর কথাই বেশী উচ্চারিত হয়। আমাদের বহুল পরিচিত SINGER MACHINE তারই আবিষ্কার।

পোশাক শিল্পের সূচনাঃ সেলাই মেশিন আবিষ্কৃত হওয়ার পরও সাথে সাথে কিন্তু পোশাক শিল্পের সূচনা হয়নি। ১৮২১ সালে সর্ব প্রথম ফ্রান্সের প্যারিসে ৮০টি মেশিন নিয়ে পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। এরপর ১৮৫৬ সালে বৃটেনের লিডসে ৩০টি মেশিন নিয়ে বৃটিশ পোশাক শিল্পের সূচনা হয়।

পোশাক শিল্পে বাংলাদেশঃ বাংলাদেশে পোশাক শিল্প যাত্রা শুরু করে ১৯৭০ সালে রিয়াজ গার্মেন্টস্ এর মাধ্যমে। কিন্তু বাংলাদেশ প্রথম তৈরী পোশাক রপ্তানি করে ১৯৭৩ সালে। এ বছর যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ১০,০০০ পিস্ শার্ট রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নবযুগের সূচনা হয়। বর্তমানে এ শিল্পের মাধ্যমে এ দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ অনেক মজবুত হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রধানতম ভূমিকা রাখছে। পোশাক শিল্প বর্তমানে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৭৬ শতাংশ আসে পোশাক শিল্প থেকে। দেশের মোট কর্মক্ষম জনশক্তির বিরাট একটি অংশ এ শিল্পের সাথে জড়িত। তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্ছে এ শিল্পের মাধ্যমে। পাশাপাশি গুনগত মানের কারনে এদেশের তৈরী পোশাকের চাহিদা বিদেশের বাজারে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রুত বিকাশ লাভ করছে এর পরিসর। ১৯৯২-৯৩ সালে যেখানে এদেশে তৈরী পোশাক কারখানার সংখ্যা ছিল ১৫৩৭টি (বিজিএমইএ এর হিসাব অনুযায়ী) সেখানে ২০০২-০৩ পর্যন্ত মোট দশ বছরে এ পরিমান বেড়ে দাড়িয়ে ছিল ৩৭৬০ টিতে এবং বর্তমানে এর সংখ্যা প্রায় ৪৬০০। এ পরিসংখ্যান এটাই প্রমাণ করে যে, এদেশের সবচেয়ে উৎপাদনশীল ও মুনাফা ভিত্তিক শিল্প এ পোশাক শিল্প।

অনেকে ধারণা করেছিলেন যে কোটা ব্যবস্থা উঠে গেলে এদেশের পোশাক শিল্পের ব্যাপক ধ্বস নামবে। অনেক কারখানা কাজের অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, আমাদের পোশাকের বাজারে ছোটতো হয়নি বরং আরো বড় হয়েছে। সাময়িক ভাবে যে সব ক্রেতা অন্যান্য দেশে কাজ করিয়েছে তারা গুনগতমান ও কর্মমূল্যের কথা চিন্তা করে পুনরায় বাংলাদেশে ফিরে আসছে।

সুতরাং কোটামুক্ত বিশ্ব আমাদের জন্য অভিশাপ নয় বরং আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে।

পোশাক শিল্পের উন্নয়নে করনীয়ঃ বাংলাদেশের সবচেয়ে উন্নয়নশীল শিল্প হল পোশাক শিল্প। এদেশের অর্থনীতির বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এর অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল এ শিল্পের অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে যা যা করা দরকার তার খুব কমই করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ক্রমহ্রাসমান LEAD TIME মোকাবেলা করার জন্য বিজিএমইএ এর পক্ষ থেকে সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছিল CENTRAL BONDED WEAR HOUSE করার জন্য যেখানে FABRIC ও ACCESSORIES আগে থেকে মজুদ থাকবে। কিন্তু এই দাবী বাস্তবায়িত হয়নি। এর ফলে বর্তমানে আমাদের পোশাক শিল্পগুলোকে FABRIC ও ACCESSORIES এর জন্য বিদেশী সরবরাহকারীর সময় ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করতে হয় কারন আমরা TEXTILE শিল্পে এখনও যথেষ্ট সমৃদ্ধ হতে পারিনি। পরিসংখ্যান বলে এদেশের TEXTILE MILL দেশীয় চাহিদার মাত্র ১৯ শতাংশ পূরণে সক্ষম। এছাড়া ICD (INTERNAL CONTAINER DEPOT) এবং DEEP SEA PORT করার দাবী পূরণ হয়নি। অথচ এ শিল্প তথা দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে এ দাবীগুলো পূরন হওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি।

অশনি সংকেতঃ গত ২০ মে, ২০০৬ ইংরেজী তারিখ এদেশের ইতিহাসে একটি কালো দিন হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। এদিন আমাদের পোশাক শিল্পের উপর একটা ভয়াবহ আঘাত নেমে আসে। ঐ দিন দাবী আদায়ের নামে কতিপয় দুষ্কৃতকারী ক্ষতবিক্ষত করেছিল এদেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময়ী খাতটিকে। কিছু মানুষ দাবী করে যে এটি শ্রমিক অসন্তোষ। তবে খোজ নিয়ে জানা যায় যে সব কারখানা ভাংচুর করা হয় তার অধিকাংশে শ্রমিকদের দাবী যথাযথভাবে পালন করা হয় শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ করা হয় এবং SOCIAL COMPLAINCE পুরোপুরি মেনে চলা হয়। এরপরও এ ধ্বংসযজ্ঞ কি এটাই প্রমান করেনা যে, এটি ছিল অগনিত মানুষের ভাগ্যকে গলা টিপে হত্যা করার একটি অপপ্রয়াস মাত্র। হ্যাঁ একথা সত্য যে, কিছু মালিক তার শ্রমিকদের ব্যাপারে সচেতন নয়। কিন্তু সকলের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে তথা মালিক শ্রমিক সু-সম্পর্কের নিমিত্তে এবং SOCIAL COMPLAINCE পুরোপুরি কার্যকর করা, এ শিল্পকে সাবলিল ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেমন মালিকদের সততা ও স্বদিচ্ছা প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন শ্রমিকদের সহনশীলতার।

পরিশেষঃ বাংলাদেশের অর্থনীতি সমীক্ষা ২০০৬ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৪-০৫ অর্থবছরে পোশাক শিল্পের মাধ্যমে মোট রপ্তানি আয় হয়েছে ৬৪১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ শিল্প কতবড় ভূমিকা রাখছে তা উপরোক্ত তথ্যেই প্রমাণ হয়। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে পোশাক শিল্প।

আজ থেকে ৩৫ বছর আগে এদেশের পুবাকাশে উদিত হয়েছিল স্বাধীনতার সূর্য। যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন নিয়ে এদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা জীবন দিয়ে এদেশের মানুষকে দিয়েছিল মুক্তির স্বাদ। সে স্বপ্ন সেদিন সফল হবে, যেদিন এদেশের কোথাও ক্ষুধিতের আর্তনাদ শোনা যাবে না, বিনা চিকিৎসায় কেউ কষ্ট পেয়ে মৃত্যু বরণ করবে না। এদেশের সূর্যসন্তানদের এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে চাই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। পোশাক শিল্প সেই সমৃদ্ধি অর্জনের পথে সবচেয়ে বড় সহায়তা করছে। বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে এবং আয় স্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক পরিবার এ শিল্পের মাধ্যমে নিজেদের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে এনেছে। এদেশের মানুষের মাথা পিছু আয় বেড়েছে। যে বেকার যুবক পরিবারের বোঝা হয়েছিল সে আজ তার পরিবারের শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এ শিল্পকে কেন্দ্র করে অনেক শিল্প গড়ে উঠেছে, ব্যাংক বীমা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সার্বিকভাবে অর্থনীতি হয়েছে সমৃদ্ধ উন্নয়নের ধারা পেয়েছে নতুন গতি।

সুতরাং একক নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পোশাক শিল্প আমাদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। এর হাত ধরে একদিন বাংলাদেশ সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছাবে এবং বাংলাদেশ উন্নত দেশের কাতারে সামিল হবে এ প্রত্যাশা রাখি।

মোবাইল ফোন ঃ আশীর্বাদের অন্তরালে অভিশাপের কালো ছায়া

ফারহানা ইসলাম, ডিজাইন কো-অর্ডিনেটর

ইউরেনিয়াম দিয়ে পারমানবিক চুল্লীর মাধ্যমে বিদ্যুৎ তৈরী করে মানুষ সভ্যতার ভিৎ রচনা করেছে। আবার ইউরেনিয়াম দিয়ে পারমানবিক বোমা তৈরী করে নগর বন্দর জনপদ ধ্বংস করে পৃথিবীতে ঘৃণ্যতম ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নব উদ্ভাবনে মানব সভ্যতার যে কল্যাণ সাধিত হয়েছে যুগে যুগে তেমনি অকল্যাণও বয়ে আনছে। হিরোশিমা, নাগাসাকি বা চেরনোবিলে বিস্ফোরণের প্রভাব মানব সভ্যতার দীর্ঘতম বা দীর্ঘমেয়াদী অকল্যাণ। যেন প্রযুক্তির আশীর্বাদের পাশাপাশি অভিশাপের সহাবস্থান। প্রযুক্তি যখন মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন অকল্যাণের কথা ভেবে দেখা হয় না। চলমান বিশ্বায়নের যুগে যে প্রযুক্তিটি দ্রুত প্রসারমান তা হচ্ছে মোবাইল কমিউনিকেশন প্রযুক্তি। নিঃসন্দেহে এ প্রযুক্তি মানব সভ্যতাকে অনেক উঁচুতে নিয়ে গেছে। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, বিশ্বব্যাপী মোবাইল ফোনের স্বাস্থ্য ঝুঁকির ব্যাপারটি এখন মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানী, গবেষকগণ গবেষণা করে বিভিন্ন মত দিয়েছেন মোবাইল ফোনের স্বাস্থ্য ঝুঁকির ব্যাপারে। ফিনল্যান্ডের রেডিয়েশন এন্ড ইউরেনিয়াম সিকিউরিটি অথরিটির এক গবেষণায় দেখা গেছে, ব্যাপক মোবাইল ফোন ব্যবহারের ফলে দেহের কোষগুলোর প্রোটিনের কর্মক্ষমতা বেড়ে যায়। ফলে মানবদেহের কোষগুলো সংকুচিত হয়ে আন্তঃকোষীয় গ্যাপ সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে মাথা ব্যথা ঘুমের সমস্যা, ক্লান্তিজনিত অবসাদ, দীর্ঘ দিন মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে ব্রেন টিউমার হবার আশংকা আছে বলে মনে করছেন অনেক গবেষক।

ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক ইঁদুরের মস্তিষ্কে সেলফোনের মাইক্রোওয়েভ প্রক্ষেপণ করে দেখেছেন, এর ফলে ইঁদুরের DNA বিশ্লিষ্ট হয়ে কোষের মৃত্যু হার বেড়ে গেছে। মোবাইল ফোন বাটনে চাপ দিলে আমরা অপর প্রান্তে যে নাম্বারটিকে সিগন্যাল হিসেবে পাঠাই, এই ইলেট্রিক সিগন্যালটি হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ যা মানবদেহ শোষন করে। এটি চলাচল করার সময় মানবদেহের এনার্জি ধ্বংস হয় এনার্জি ধ্বংসকারী তরঙ্গই হচ্ছে রেডিয়েশন। এক্স-রে+গামা-রে=রেডিয়েশন। এক্স-রে রক্তের অনুচক্রিকা ভেঙ্গে দেয়। গামা-রে DNA-র কাঠামো পরিবর্তন করে দেয় যার ফলে ক্যান্সার থেকে শুরু করে নানা ধরনের রোগের সৃষ্টি হতে পারে। গবেষকরা মনে করছেন, মানব দেহের মস্তিষ্কে মাইক্রো ওয়েভের এক্সপোজারের একটা প্রভাব আছে। এটা যদি দীর্ঘ মোয়াদী হয় তাহলে মোবাইল ফোনের বেশী ব্যবহার আমাদের মানব সভ্যতার জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে খুবই নিম্নমানের মোবাইল ফোন সেট ব্যবহৃত হয় যা খুবই ত্রুটিপূর্ণ। টেকসই নয়-এমন কিছু মোবাইল ফোন বিদেশ থেকে আমদানী হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে, যে গুলো স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ন কিনা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। আর মোবাইল কোম্পানীগুলো যে নিম্নমানের সেট নিয়ে প্যাকেজ ছাড়ছে, সেটাও নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এজন্য বড় ফোন বিপর্যয়ের আগেই সতর্কতা অবলম্বর করা উচিৎ এবং একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরী করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকারকে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে। সেই সঙ্গে ডাকও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ মন্ত্রণালয়, দেশের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগীতাও একান্তভাবে কাম্য। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই কেবলমাত্র পারে এ ধরনের দূর্যোগ মোকাবেলা করতে আর মোবাইল ফোনের সেবা যেন অভিশাপ না হয়ে উঠে, সে ব্যাপারে সবার সজাগ থাকা প্রয়োজন।

ব্যাবিলনের প্রধান ভবন

আমাদের মধ্যবিত্ত মানসিকতায় গার্মেন্টস মানেই একটি গতানুগতিক চিত্র ফুটে ওঠে। এই যেমন, স্যাঁতস্যাঁতে আবদ্ধ ঘর, মেশিনের খট্ খট্ আওয়াজ আর কিছু অবহেলিত, নিষ্পেষিত নিষ্প্রাণ মানুষের মুখ। অনাচার আর অবহেলায় যাদের জীবন জর্জরিত।

মধ্যবিত্তের এই ধারণা বদলানোর দিন এসে গেছে। ব্যাবিলন এই ধারণা বদলে দিয়েছে। এখানে কর্মীরা অবহেলিত নয়। ব্যাবিলন ওদের পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। জীবন ধারণ ও যাপনের সব উপকরণ ওরা এখান থেকেই পূরণ করতে পারে। নিচের সচিত্র প্রতিবেদন তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

-সোনিয়া ইসলাম (রিতু), প্রাক্তন ওয়েলফেয়ার অফিসার

কর্মীদের কর্মক্ষেত্র

কর্মীদের খাবারের জায়গা

ডে-কেয়ার সেন্টার

ফার্ষ্ট এইড টিমের দ্বারা তাৎক্ষণিক প্রাথমিক চিকিৎসা দান।

ট্রেনিং সেন্টার যেখানে কর্মীদের নিয়মিত সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়

ট্রেন্ডজ্

জুনিপার এমব্রয়ডারিজ

ব্যাবিলন কর্মীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আগুন নিভানো কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ

ব্যাবিলন টেক্সটাইল

ব্যাবিলনের প্রধান ভবন

আমাদের মধ্যবিত্ত মানসিকতায় গার্মেন্টস মানেই একটি গতানুগতিক চিত্র ফুটে ওঠে। এই যেমন, স্যাঁতস্যাঁতে আবদ্ধ ঘর, মেশিনের খট্ খট্ আওয়াজ আর কিছু অবহেলিত, নিষ্পেষিত নিষ্প্রাণ মানুষের মুখ। অনাচার আর অবহেলায় যাদের জীবন জর্জরিত।

মধ্যবিত্তের এই ধারণা বদলানোর দিন এসে গেছে। ব্যাবিলন এই ধারণা বদলে দিয়েছে। এখানে কর্মীরা অবহেলিত নয়। ব্যাবিলন ওদের পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। জীবন ধারণ ও যাপনের সব উপকরণ ওরা এখান থেকেই পূরণ করতে পারে। নিচের সচিত্র প্রতিবেদন তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

-সোনিয়া ইসলাম (রিতু), প্রাক্তন ওয়েলফেয়ার অফিসার

কর্মীদের কর্মক্ষেত্র

কর্মীদের খাবারের জায়গা

ডে-কেয়ার সেন্টার

ফার্ষ্ট এইড টিমের দ্বারা তাৎক্ষণিক প্রাথমিক চিকিৎসা দান।

ট্রেনিং সেন্টার যেখানে কর্মীদের নিয়মিত সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়

ট্রেন্ডজ্

জুনিপার এমব্রয়ডারিজ

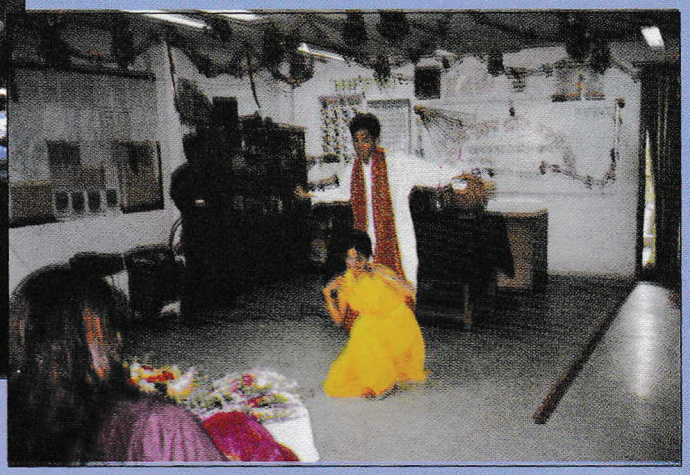

ব্যাবিলন কর্মীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আগুন নিভানো কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ

ব্যাবিলন টেক্সটাইল

মানুষ ও আদর্শ বাবা

আবু জার গিফারি, জুনিয়র অফিসার (আর এন্ড ডি)

মানুষের কথা আমি অনেক ভেবেছি, মানুষের কথা, তার সুখ-দুঃখের কথা, তার নির্বুদ্ধিতার কথা, তার বুদ্ধিমত্তার কথা, তার পাপ ও পুণ্যের কথা, ভেবে সুনির্দিষ্ট কিছু পাই না, মানুষ এক অবিনাশী শক্তি। বারবার তার পতন ঘটে আবার সে উঠে দাঁড়ায়। কে কোথায় মরল, কে কোথায় পড়ল তা বড় কথা নয়, সমষ্টিগত ভাবে যে মানুষ একটা কিছুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তার সেই লক্ষ্যবস্তু কি, তা কি সে জানে ?

মানুষকে এ প্রশ্ন করলে অনেক রকম উত্তর মিলবে। হয়তো সব উত্তরই ঠিক আবার হয়তো সবই বেঠিক, বা কিছু আংশিকভাবে ঠিক এবং কিছু বেঠিক। মানুষের সুখ-দুঃখের হিসাবে ও অনেক গরমিল আছে।

আমি আমার মতে তো দেখি পৃথিবীর একটি মানুষ ও নিরবিচ্ছিন্ন দুঃখের মধ্যে থাকে না। যে মানুষের পেটে খাদ্য নাই, পরনে বস্ত্র নাই, সে ও সর্বদা দুঃখের মধ্যে থাকে না সেও হয়তো জোৎসনা দেখলে হাসে, সুন্দরী রমনী দেখলে মুগ্ধ হয়। গান শুনে গুন গুন করে দু এক কলি গেয়ে উঠে। সেও হয়তো খুশি হয় গোলাপ দেখলে

আমার বাবার বিত্ত ছিল না, কিন্তু তাই বলে তিনি লোভী বা অসৎ ছিলেন না। সদুপায় উপার্জন করতেন। অপব্যয়কে বড় ঘৃণা করতেন, তাঁর হিসেব ছিল অনেকটা এরকম, কৃপণতা করো না, কিন্তু অপব্যয়ীও হয়ো না। অর্থাৎ মিতব্যয়ী হও।

ছোটবেলা থেকেই মায়ের কাছ থেকে দুরে ছিলাম, তাই স্বভাবতই বাবার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ি। বাবা শাসন করতেন আবার আদরও করতেন। আমার সমস্ত মন-প্রাণ উৎকর্ণ থাকতো বাবার পদশব্দ শোনার প্রতি। তার গায়ের গন্ধ সুকার্থে, প্রেরণা দানের অভ্যাস আজো আমাকে মোহিত করে।

আজকাল দেখা যায় পিতার মৃত্যু হলে পুত্রের চোঁখে জল আসতে চায় না। মুখটা কাঁচুমাচু করে একটা শোকের ভাব ফুটিয়ে রাখে মাত্র। হয়তো অন্তরে কিছুটা শোক বোধ করে, তাবে তা তেমন তীব্র নয়। আমি তাদের দোষ দেই না। কারণ হয়ত এটাই যুগের ধর্ম। টান-ভালবাসায় আমরা যতটা দেউলিয়া হয়েছি, ভাত-কাপড়ে ও ততটা হইনি। তাছাড়া এখন যুক্তি বাদের যুগ, হৃদয়াবেগের নয়। হৃদয়ের চর্চা ক্রমেই যেন কমছে, মস্তিষ্ক দিয়ে তো আর শোক করা যায়না।

যাক, ধান ভানতে শিবের গীত হচ্ছে, বলছিলাম বাবার কথা। সে কথা বলতে শুরু করলে সহজে শেষ হবে না। দু' একটা দৃষ্টান্ত দেই যাতে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মহানুভবতা কিছুটা বোঝা যায়।

তিনি প্রায়ই কিছু না কিছু দান করতেন। কিন্তু লোকে যেভাবে দু একটা পয়সা ভিক্ষা দিয়ে আপদ বিদায় করে, তাঁর দান সেরূপ ছিল না। তিনি তাকে ডেকে ঘরে বসাতেন, মিষ্টি কথা বলতেন, সাহস, সান্ত্বনা,

ভরসা দিতেন, কাজ করার প্রেরণা দিতেন। তার পর নিরহঙ্কারের সাথে দান করতেন।

তিনি আমাদের কে এমনটা করতে বলতেন। আমরা তার এসব আচরনে তখন কিঞ্চিৎ বিরক্তও হতাম। তিনি আমল দিতেন না, বাবার আর একটা গুন হলো, তিনি দাসত্ব পছন্দ করতেন না। স্ব-নির্ভরতাই ছিল তার জীবনের লক্ষ্য। সেই পাকিস্তান-আমলে চাকুরী সুলভ ছিল না তিনি শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। এটা তাঁর বাবার (আমার দাদার) পছন্দ ছিল।

বাবা ও তাঁর বাবার ভক্ত ছিলেন। ৪৫ টাকা বেতন পেতেন তা থেকে বাবাকেই দিয়ে দিতেন !! কি আসাধারন। আজকাল কটি সন্তান এমনটা করতে পারে?

আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। শিক্ষকতা পেশায় মাসের শেষে সামান্য অর্থ উপার্জনের বাইরে তাঁর আরেকটি অসামান্য উপার্জন ছিল। সেটা ছিল সহকর্মীদের আস্থা সম্মান ও ভালবাসার উপার্জন।

যেখানে যেতাম সেখানেই দেখতাম বাবাকে যারা চিনেন তাঁরা তাকে গভীরভাবে ভালবাসেন শ্রদ্ধা করেন, এবং পরামর্শ নেন। চরিত্রবান পিতার সন্তান হওয়া পরম ভাগ্যের ব্যাপার। সেদিক থেকে আমি ভাগ্যবান।

আমার পিতা ধনী এটা বলার মধ্যে কোন গৌরব আছে কিনা জানিনা। তবে আমার পিতা 'সৎ ও চরিত্রবান' এ কথা বলতে পারায় অনেক গৌরব, অহংকার ও তৃপ্তি আছে তা বুঝি।

মনে হয়, আজ বোধহয় সে সব পিতার দিন শেষ হয়েছে। এই বহির্মুখী উদ্দাম, গতিসম্পন্ন জগতে পিতা এখন একজন ব্যক্তিমাত্র, জন্মদাতা, লালন-পালন কর্তা এবং জোগানদার, তার বেশী কিছু নয়। যাবার আগে আদর্শ বাবার একটা আদর্শ বানী পাঠক কূলকে বলে যাই। যা এখনো চিঠিতে বাবা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেন-

বিদ্যালাভ, সৎজীবন, পরোপকার,
উজ্জ্বল করিবে তব, ইহ-পরকাল।

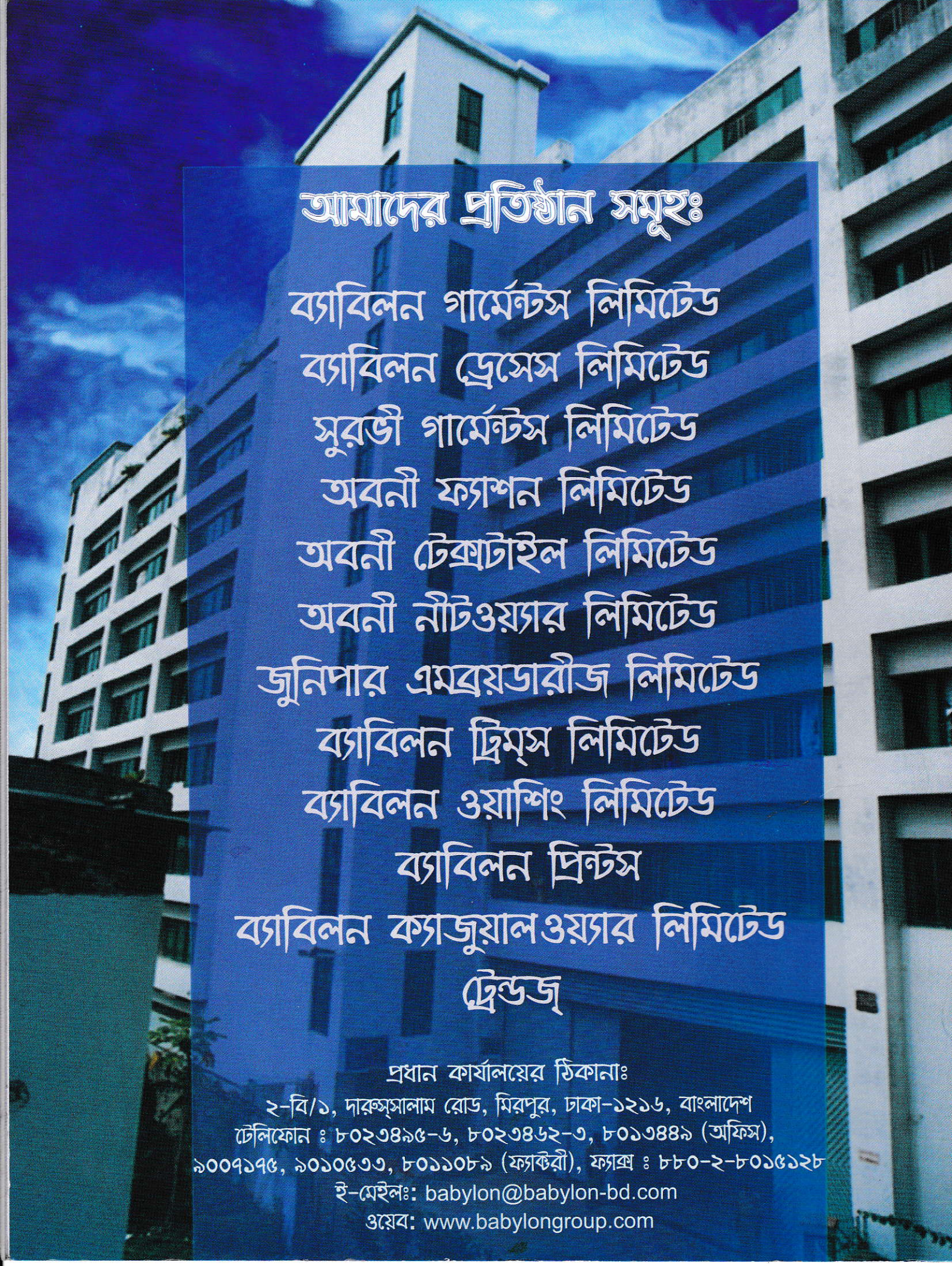

আমাদের প্রতিষ্ঠান সমূহঃ

ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড
ব্যাবিলন ড্রেসেস লিমিটেড
সুরভী গার্মেন্টস লিমিটেড
অবনী ফ্যাশন লিমিটেড
অবনী টেক্সটাইল লিমিটেড
অবনী নীটওয়্যার লিমিটেড
জুনিপার এমব্রয়ডারীজ লিমিটেড
ব্যাবিলন ট্রিম্‌স লিমিটেড
ব্যাবিলন ওয়াশিং লিমিটেড
ব্যাবিলন প্রিন্টস
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড
ট্রেন্ডজ্‌

প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানাঃ
২-বি/১, দারুস্‌সালাম রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ
টেলিফোন ঃ ৮০২৩৪৯৫-৬, ৮০২৩৪৬২-৩, ৮০১৩৪৪৯ (অফিস),
৯০০৭১৭৫, ৯০১০৫৩৩, ৮০১১০৮৯ (ফ্যাক্টরী), ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮০১৫১২৮
ই-মেইলঃ babylon@babylon-bd.com
ওয়েব: www.babylongroup.com